ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ।। ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ১৪ ডিসেম্বর, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

মুসলিম জনগোষ্ঠীদেরও সংরক্ষণভুক্ত করছে সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক ভয়াবহ যুগের সূচনা করতে চলেছে সিপিএম। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুসলমান ভোট হারানোর ভয়ে প্রায় ৩০টি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সংরক্ষণের আওতায় আনতে চলেছেন। এখন মুসলমানদের ছটি জাতিগোষ্ঠী আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস বা ওবিসি কোটায় চাকরি ও শিক্ষায় সংরক্ষণের সুযোগ পায়। এই সংখ্যাটা আরও ৩১ বাড়বে। রাইটার্স সূত্রের খবর, সিপিএমের এই ভয়াল নীতি প্রণয়ন হলে দেখা যাবে, মুসলিমদের মধ্যে প্রায় আর কোনও শ্রেণী নেই যারা এই সংরক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে না। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত মুসলমান সমাজকে সংরক্ষণের আওতায় আনার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। আসলে ২২ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষিত আসনের সিংহভাগ মুসলমানরাই দখল করবে। মহাকরণের এক শ্রেণীর আমলা সরকারকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, যাতে সরকার যেন পুরো মুসলমান সমাজকে সংরক্ষণের আওতায় না নিয়ে আসে। তাহলে রাজ্যে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। হিন্দুদের মধ্যে তীব্র আক্রোশ তৈরি হবে। কারণ, হিন্দুদের মধ্যে যত জনগোষ্ঠী রয়েছে তার খুব সামান্য সংখ্যাই ওবিসি তালিকাভুক্ত। অথচ সরকার যে ব্যবস্থা গড়তে চলেছে তাতে পুরো মুসলমান সমাজ সংরক্ষণের সুযোগ পাবে। কীভাবে? সরকারি কর্তারা জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে যে শ্রেণীর মুসলিম বাস করে তারা কয়েকপুরুষ আগে ধর্মান্তরিত হয়েছে। মূলত সমাজের নীচের অংশের থেকেই ওই ধর্মান্তর হয়েছিল। ফলে পেশাগত ভাবে যারা সমাজে একসময় উচ্চ আসনে ছিল না তারাই ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছিল। এখন মুসলিমদের সংরক্ষণের যে নীতি সরকার নিয়েছে তাতে বলা হয়েছে, হিন্দু ময়রা ওবিসি হলে মুসলিম ময়রাও হবে। হিন্দু ধোপা, নাপিত ওবিসি হলে মুসলিমদেরও একই সুবিধা দেওয়া হবে। তাতে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে বসবাসকারী প্রায় পুরো মুসলিম সমাজ সংরক্ষণের সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। কারণ এরাজ্যে মধ্যপ্রাচ্যের কুলীন মুসলমানদের বসবাস তেমন নেই। কিন্তু উল্টোদিকে হিন্দুদের অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সামান্য কয়েকটি ওবিসি সংরক্ষণ পায়। মুসলমানদের জন্য এই কোটায় সংরক্ষণ চালু হলে কার্যত ওবিসি কোটা মুসলিম কোটায় পর্যবসিত হবে। আগামী বিধানসভা ভোটের আগে সরকার এই খেলায় মাততে চলেছে বলেও মনে করা হচ্ছে।

সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের নথিপত্র লোপাট

সাজাপ্রাপ্তরা বহাল তবিয়তে

গূঢ়পুরুষ।। প্রয়াত ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাশ্মীরে বন্দি থাকাকালে মৃত্যু রহস্যের সত্য জানার অধিকার ভারতবাসীর আছে। এর জন্য তথ্য জানার অধিকার আইনও আছে। কিন্তু বাস্তবে এই আইনকে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মানছে না। সরকারের 'অপছন্দের তথ্য' আইনমাফিক জানতে চাইলে বলে দেওয়া হয় ক্ল্যাসিফায়েড ইনফরমেশন। অর্থাৎ, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে অতি গোপনীয় তথ্য যা প্রকাশিত হলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। তাই তথ্য দেওয়া যাবে না। ডঃ মুখোপাধ্যায় এবং প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর তাসখন্দে রহস্যজনক মৃত্যুর কোনও তথ্যই কেন্দ্রীয় সরকার দেবে না। সবই নাকি দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করতে 'অতি গোপনীয় তথ্য'। আসলে দেশ নয়, কংগ্রেস দলের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে তাই ডঃ মুখোপাধ্যায় এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর কারণ জানানো হবে না।

অনিল বসু

বিনয় কোঙার

পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার তথ্য গোপনের কৌশলে কেন্দ্রের থেকে এগিয়ে। সি পি এম পরিচালিত সরকারি দফতরের আমলারা দলের স্বার্থ বিরোধী তথ্য লুকিয়ে রাখে না। বেবাক লোপাট করে দেয়। যেমনটি সম্প্রতি হয়েছে বর্ধমানের সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের মামলার নথি নিয়ে। আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে ১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ বর্ধমান শহরের সাঁই পরিবারের দুইজনের নৃশংস হত্যা মামলার নথিপত্র কলকাতা হাইকোর্টের কাছে থাকার কথা। কিন্তু মামলার নথিপত্র সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট তলব করলে জানিয়ে দেওয়া হয় সাঁইবাড়ি হত্যা মামলার কাগজপত্র হাইকোর্টের মহাফেজখানা থেকে লোপাট হয়ে গেছে। কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

ঘটনাটি এই রকম। সংবিধানের ৩২ নম্বর ধারায় সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় আবেদনকারী আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেন সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তদের তিনজনকে কলকাতা হাইকোর্ট ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়। এই তিন সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বর্তমান শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন এবং সি পি এম পার্টির বড় নেতা বিনয় কোঙার। ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাজাপ্রাপ্ত এই তিনজনকে কলকাতা হাইকোর্ট 'প্যারোলে' মুক্তি দেয়। আইনগতভাবে 'প্যারোল' শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই মঞ্জুর করা হয়। জয়দীপবাবু তাঁর আবেদনে জানতে চেয়েছিলেন এই সি পি এম নেতারা ঠিক কতদিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়েছিলেন। এরপরেই সুপ্রিম কোর্ট সাঁইবাড়ি হত্যা মামলার যাবতীয় নথিপত্র কলকাতা হাইকোর্টের মহাফেজখানা থেকে চেয়ে পাঠায়। তখন দেখা যায় যে সাঁইবাড়ি হত্যা মামলার কাগজপত্র লোপাট হয়ে গেছে।

সাঁইবাড়ি হত্যা মামলায় মোট ১৭ জন সি পি এম নেতা ও কর্মীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়। তারমধ্যে পাঁচজনের বিরুদ্ধে সরাসরি খুনে যুক্ত থাকার অভিযোগ ছিল। অভিযুক্ত পাঁচজন সি পি এম নেতা হচ্ছেন, বিনয় কোঙার, নিরুপম সেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত বন্দ্যোপাধ্যায় (পল্টু), অমল হালদার ও মানিক রায়। পাঠকের বুঝতে অসুবিধা নেই যে কেন হাইকোর্টের মহাফেজখানা থেকে সাঁইবাড়ি হত্যা মামলার যাবতীয় নথিপত্র লোপাট হয়েছে।

এখন দেখার যে সুপ্রিম কোর্ট নথি লোপাটের ঘটনাটি কীভাবে বিচার করে।

উত্তর-পূর্বেও মাওবাদী রেড-করিডর

পারমিতা লিভিংস্টোন।। পূর্বোত্তরের দিকে ক্রমশ আগুয়ান হচ্ছে নকশালরা। দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে পূর্ব ভারতের ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহারে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে মাওবাদীরা। ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবাংলা সীমান্তে মাওবাদীদের ক্যাম্প রয়েছে। এখান থেকে

একের পর এক হামলা চালাচ্ছে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলগুলো দখলে আনার জন্য। কুখ্যাত রেড করিডর অক্টোপাসের মতো শুঁড়ের কব্জায় নিয়ে আসছে পূর্বোত্তরের জঙ্গিদের। যোগসূত্র তৈরি হয়েছে। মণিপুরের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পি এল এ) সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে মাওবাদীদের জন্য। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলা এবং ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূমে অন্ততঃপক্ষে সাত হাজার সশস্ত্র মাওবাদী ছড়িয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে মাওবাদীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে মণিপুরের পি এল এ-র কট্টর ঘাটি জঙ্গি। জঙ্গলে বসবাসকারী সাঁওতাল গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। মাত্র কয়েক মাস আগে চীনে তৈরি প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র কিনেছে মাওবাদীরা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অস্ত্রের চোরা-কারবারীদের কাছ থেকে মূলত, এল টি টি ই-র জন্য।

এল টি টি ই-র অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর মাওবাদীরা এই অস্ত্রগুলো কিনতে আগ্রহী হয়। অস্ত্রগুলো বাংলাদেশের কোনও গোপন ঘাঁটিতে রয়েছে বলে জানা গেছে। এন এস সি এন (আই এম) অস্ত্র বেচাকেনার বিস্তৃত নেটওয়ার্ক চালাচ্ছে পুরো পূর্বোত্তর জুড়ে। এই নেটওয়ার্ক থেকেই অস্ত্রগুলো সরবরাহ করা হয়েছে। মূলত দু'টো রুটের মাধ্যমে অস্ত্রগুলো ভারতে ঢোকানো হচ্ছে। মায়ানমার এবং বাংলাদেশ ত্রিপুরাকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করে একটা কন্‌সাইনমেন্ট পাচার করা হয়েছিল। চোরাই অস্ত্রগুলোর মধ্যে ৮৫০টা এ কে ৪৭ রাইফেল, ৪০০০ ছোট আগ্নেয়াস্ত্র শতাধিক গ্রেনেড ছাড়াও চীনে তৈরি আমেরিকান এম-১৬ রাইফেল, রাশিয়ান কালাশনিকভ, এ কে ৪৭ এবং এ কে ৫৬-এর সস্তা সংস্করণ বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। চীনের সঙ্গে পরেশ বড়ুয়ার ঘনিষ্ঠতা এবং চীন থেকে চোরাপথে অস্ত্র বেচা-কেনায় উলফা প্রধানের সক্রিয় ভূমিকার জন্য মাওবাদীরা চেষ্টা করছে উলফার সাথে একটা যোগসূত্র তৈরি করার। দক্ষিণ চীনের উনান প্রদেশ থেকে মায়ানমারের জঙ্গিদের মাধ্যমে উলফা এই অস্ত্র সরবরাহ করুক এমনই পরিকল্পনা মাওবাদীদের। উলফা প্রধান পরেশ বড়ুয়া বর্তমানে চীনে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ। মাওবাদী নেতারা পূর্বোত্তরে অস্ত্রের চোরাকারবারের কিংপিন পরেশ বড়ুয়ার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে।

এদিকে এন ডি এফ বি - বোড়ো উগ্রপন্থী দল চাইছে বাংলাদেশ থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চীনে ঢুকতে। চীনের সাথে ক্লোজ নেক্সাস তৈরি করতে চাইছে। আসামের সাথে অরুণাচল প্রদেশের সীমান্ত এবং শেষোক্ত রাজ্যটির প্রতি চীনের নজরের ফলে এন ডি এফ বি স্বভাবতঃই গুরুত্ব পাবে বলে

(এরপর ১৩ পাতায়)

হিলিংটাচ্ বিফলে

আত্মসমর্পণে নারাজ কাশ্মীরী জঙ্গিরা

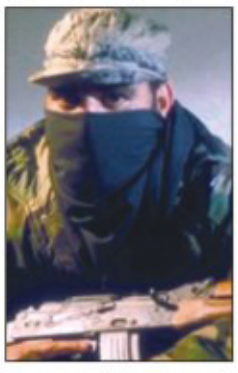

সংবাদদাতা ঃ জম্মু-কাশ্মীরে নিরাপত্তা-বাহিনী ভয়ঙ্কর সব উগ্রপন্থীদেরকে মূল স্রোতে ফেরাতে 'হিলিং টাচ্'-এর নামে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাস্তবে উগ্রপন্থীরা সেপথ আদৌ মাড়ায়নি। ফলে জম্মু-কাশ্মীরে ঢুকে পড়া হার্ডকোর সন্ত্রাসবাদীদের হঠাতে হট-পারসুট ছাড়া গত্যন্তর নেই। পুলিশ রেকর্ড অনুসারে গত তিন বছরে সন্ত্রাসবাদ উপদ্রুত পুঞ্চ এবং রাজৌরি জেলাতে একজনও উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেনি। অপরপক্ষে নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে লস্কর এ তৈবা এবং হিজবুল মুজাহিদিন-গোষ্ঠী-র উঁচুদরের ৪৫ জন সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছে।

পুঞ্চ জেলায় ২০০৮-এ ২১ জন, ২০০৭-এ ১৬ জন এবং এবছর অক্টোবর অবধি ৮ জন সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছে। আর রাজৌরি জেলাতে বিগত তিন বছরে (২০০৬-০৭-০৮) মাত্র ১১ জন সন্ত্রাসবাদী আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু এবছর (২০০৯) একজনও ওপথ মাড়ায়নি।

নবগঠিত রিসাই জেলাতেও স্বল্প সময়ে নিরাপত্তাবাহিনী ১৫ জন সন্ত্রাসবাদীকে শেষ করতে পেরেছে। জেলাতে সর্বমোট ১৯ জন সন্ত্রাসবাদী মারা পড়েছে।

(এরপর ১৩ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

সংস্কার ভারতী, দক্ষিণবঙ্গের প্রাদেশিক শিল্পী সম্মেলন

ভরত কুণ্ডু ।। এবার আঞ্চ লিক স্তরে দক্ষিণবঙ্গের তিনটি স্থানে শিল্পী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

গত অক্টোবর-নভেম্বরে নবদ্বীপ ধামে কলকাতা, উ. ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হুগলী ও নদীয়া জেলার ১৯৩ জন শিল্পী সমবেত হন। বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী শিখারাণী বাগ এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডঃ গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন । শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের ৫০০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নবদ্বীপের নানা পথ পরিক্রমা করে।

কুলটি, বার্ণপুর, নিঘা, বোগরা, দুর্গাপুর, তারাপীঠ, সিউড়ি থেকে ৮০ জন শিল্পী আসানসোলে নৃত্য, সঙ্গীত, নাটক প্রদর্শন করে।

হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলা থেকে ১১১ জন শিল্পী মেদিনীপুর নগরের সিপাইবাজার শিশু মন্দিরে সম্মিলিত হয়। রবীন্দ্র নিলয় হলের প্রকাশ্য সম্মেলনে বিভিন্ন শাখা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রদর্শন করেন। মুখ্য উপদেষ্টা কেশব দীক্ষিত, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী সুনিষ্ঠানন্দ, প্রথিতযশা চিকিৎসক ডাঃ বাসুদেব রায় সম্মেলনের উদঘাটন করেন।

উপরোক্ত তিনটি স্থানে 'বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা'র জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানও হয়।

পূর্বাঞ্চ ল প্রমুখ সুভাষ ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র পুইতুণ্ডী, নীলাঞ্জনা রায়, দেবাশীষ ভট্টাচার্য, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ প্রাদেশিক কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

'৬ ডিসেম্বর' উপলক্ষে রক্তদান বিদ্যার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ গত ৬ই ডিসেম্বর অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কলকাতা শাখার উদ্যোগে তাদের বিধান সরণীস্থিত কার্যালয়ে একটি রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে ওই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বস্তিকার সম্পাদক বিজয় আঢ্য। শিবিরে চবিবশ জন বিদ্যার্থী রক্তদান করেন। লাইফ কেয়ার নার্সিংহোমের চিকিৎসকদের সহযোগিতায় রক্ত সংগৃহীত হয়। প্রসঙ্গত, ভারতের সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের মৃত্যুদিন অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ প্রতিবারই সামাজিক সমতা দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। সেই উপলক্ষেই এবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

সংস্কার ভারতী, সোনারপুর শাখার মিলনমেলা

গত ৮ই নভেম্বর '০৯ রবিবার সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে সোনারপুর 'শাখা মিলনমেলা' উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোনারপুর অঞ্চ লের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়। শ্রীমতী রায় তাঁর ভাষণে বলেন, ভারতীয় পরম্পরাকে জানার দরকার, ভারতীয় সংস্কৃতিকে জানার দরকার—আর এই জানানোর কাজটাই করে চলেছে সংস্কার ভারতী। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় দুটি রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শাখা সদস্য নিত্যানন্দ মুখার্জী সুললিত কণ্ঠে দেবীস্তোত্র পাঠের মাধ্যমে বিজয়া দশমীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এরপর শাখার শিল্পীরা সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তির সুন্দর অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। আমন্ত্রিত শিল্পী আশীষ ভট্টাচার্য এর লোকসঙ্গীত ও দূরদর্শন খ্যাত বাউল শিল্পী নন্দদুলাল বাউলের বাউলগীত উল্লেখযোগ্য। সেই সঙ্গে রাজীব ও অস্তিমার আবৃত্তির অনুষ্ঠান, পার্থসারথির কীর্তন, প্রিয়াঙ্কার সঙ্গীত, নীলাক্ষির নৃত্যানুষ্ঠান, শিবাশীষ, শ্বেতা, অনিন্দিতার সঙ্গীতানুষ্ঠান সকলের মন জয় করে নেয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি শাখা সম্পাদক অমিতাভ মুখোপাধ্যায় পরিচালনা করেন এবং একটি সুন্দর অনুষ্ঠান সকল শ্রোতৃমণ্ডলীকে উপহার দেন।

গোপালীতে রক্তদান শিবির

গত ৬ই ডিসেম্বর খড়্গপুর গোপালী আশ্রম প্রাঙ্গণে আশ্রমের পরিচালনায় স্থানীয় খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালের সহযোগিতায় এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন খড়্গপুর রেলওয়ে হাসপাতালের সুপার ডঃ বিবেকানন্দ মিশ্র, আশ্রম সম্পাদক নারায়ণ মান্না, সভাপতি পরিতোষ সেনগুপ্ত, আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত কুশল কুণ্ডু, রবীন বণিক, জয়দীপ স্বর্ণকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এলাকাবাসীদের স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতায় আশ্রমে ১৭ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। আশ্রম কর্তৃপক্ষ জানান আগামীতে এই কার্যক্রম বৃহদাকারে আয়োজন করা হবে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

৬ ডিসেম্বর ঃ অবরুদ্ধ আবেগের বহিঃপ্রকাশ

ভারতের তথা হিন্দুস্থানের হিন্দুদের আবেগের মূল্য কংগ্রেস কোনদিনই দেয় নাই; সে রামজন্মভূমিই হউক কিংবা কৃষ্ণ জন্মভূমিই হউক অথবা কাশীতে আওরঙ্‌জেব কর্তৃক কূয়াতে নিক্ষিপ্ত বাবা বিশ্বনাথের পুনরুদ্ধার করাই হউক। এসবই একটি জাতির সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কলঙ্কের চিহ্ন। একটি জাতির নিকট তাহার জাতীয় কলঙ্কমোচন একটি প্রাথমিক কর্তব্য একথা আমরা আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনিয়াছি—"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম ভয়াবহ"।

খ্যাতনামা বিদেশী ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি রামমন্দিরের জায়গায় বাবরি মসজিদ থাকা উচিৎ কিনা প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, জাতির জীবনে বিজাতীয় কলঙ্ক একটি জাতীয় বোঝা স্বরূপ। দেশে জার সম্রাট একটি ক্যাথলিক চার্চ স্থাপন করিয়াছিল। আমাদের দেশের মানুষ সেটিকে চিরদিনই জাতীয় কলঙ্ক হিসাবেই দেখিত। তাই জার সম্রাটের পতনের পরে দেশের জনগণের প্রথম কাজই হইয়াছিল সেই চার্চটিকে ধূলিসাৎ করা। আপনাদের দেশের বুকের উপর এই বিজাতীয় কলঙ্ক যে এতদিন টিকিয়া আছে সেটিই আশ্চর্যের।

কংগ্রেস নেতৃত্ব শুরু হইতেই বিদেশী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় তাহারা কোনদিনই জাতীয় ঐক্য, সংহতি, জাতীয় আবেগ, ভাবাবেগ, জাত্যাভিমান, স্বদেশী চিন্তন ও জীবনদর্শন গড়িয়া তোলে নাই। ইংরেজরা শেষের দিকে অবিভক্ত ভারতে মুসলিম তাস খেলিবার বাসনায় যেরূপ রামমন্দির হিন্দুদের হস্তে তুলিয়া না দিয়া তাহা এক দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক বিষয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদেরই প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস দল তাহাদের সেই ঐতিহ্য অনুসারেই মুসলিম তোষণের নীতিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। কংগ্রেস দল জাতির আবেগকে তালা লাগাইয়া রাখিয়াছিল বহু বছর। কিন্তু হিন্দু ধর্মীয় সত্ত্বার প্রচণ্ড জনরোষেই রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস সরকার সেদিন বাধ্য হইয়াছিল রামমন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিতে।

কংগ্রেসের হিন্দুভাবাবেগকে লইয়া দীর্ঘ টালবাহনা ও অবমাননার বিরুদ্ধে তীব্র জনরোষের ফলেই এই সৌধ অপসারণ। সনিয়ার বর্তমান কংগ্রেস দল ১৭ বছর পূর্বের সেই ঘটনাকে লইয়া নির্বাচনী রাজনীতি করিতে একের পর এক কমিশন, চার্জশিট, শুনানির আশ্রয় লইয়া চলিতে বদ্ধপরিকর। তাই পুনরায় লিবারহান কমিশনের রিপোর্ট হাজির করিয়াছে। এবার শুধু বিজেপি নয়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকেও সৌধ ধ্বংসে দায়ী করিয়াছে। সংঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি অশোক সিংঘলজী স্পষ্টই বলিয়াছেন, অযোধ্যা কাণ্ড জনগণের স্বতস্ফূর্ত ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, এর পিছনে কোনও পরিকল্পনা ছিল না। তাই তাঁহাদের মতে, এই কাজের জন্য দুঃখপ্রকাশ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। লক্ষ লক্ষ হিন্দু সেদিন রামমন্দির গড়িতেই হাজির হইয়াছিল, ধ্বংস করিতে নয়। বিতর্কিত কাঠামোর পাশে ২.৭৭ একর জমি তো আমাদেরই ছিল। মাসের পর মাস বছরের পর বছর আদালতের ঢিলেমি, প্রশাসনিক বিরোধিতায় বিরক্ত জনগণের কাছে এছাড়া রামমন্দির বানানোর আর কোনও পথ বা উপায় হয়ত ছিল না। আবার এমনও হইতে পারে যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও যিনি কলির চাণক্য বলিয়া গর্ববোধ করিতেন, তাহার মেকি হিন্দুত্বের নমুনা এটি।

থাক সেইসব কথা। হিন্দু ভাবাবেগ লইয়া রাজনীতি করায় সিদ্ধহস্ত কংগ্রেসের মুখোস এবার খুলিয়া যাইবেই। সময় থাকিতে এই সমস্যার সমাধান উভয় পক্ষের মানবিকতা, সহনশীলতা, সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ঐতিহাসিক সত্যতার ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করার দায়িত্ব সরকারকেই লইতে হইবে। তাহার ভিত্তিতেই সংসদে আইন করিয়াই এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করাটাই একমাত্র পথ। পারস্পরিক দোষারোপে কালক্ষেপ করিবার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া কমিশনের রিপোর্টকে কাজে লাগানো হইতে সনিয়া নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস বিরত থাকুক—জনগণ তাহাই কামনা করে।

ঘটনা হইল, কংগ্রেস সরকার—আমেরিকার সঙ্গে কি কি গোপন চুক্তি করিয়া দেশের সর্বনাশ করিল; ডব্লু-টি ও'-র চাপে বিদেশী বাণিজ্য চুক্তি করিয়া দেশীয় বাজার-অর্থনীতির কি সর্বনাশ করিল—তাহা লইয়া এদেশের মানুষের কোনও চিন্তা নাই।

সনিয়া বিদেশিনী হইলে কি হইবে, তিনি অত্যন্ত কূটবুদ্ধি সম্পন্না। ঠিক বুঝিয়াছেন কোথায় সুড়সুড়ি দিলে কাজ হইবে। তিনি ভাল করিয়াই বুঝিয়া গিয়াছেন যে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এক কাণ্ডজ্ঞানহীন আত্মবিস্মৃত প্রজাতি। লিবারহান কমিশনের রিপোর্ট পেশ এমনই এক গেমপ্ল্যান।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

সংসারে ছোট-বড় অনেক অমঙ্গল আছে—বুদ্ধি দিয়ে বীর্য দিয়ে তার সঙ্গে লড়াই করতেই হয়, কখনও হারি কখনও জিতি—সংসারে এই নিয়ম। বিশেষ কারণে যখন অন্যমনস্ক থাকি তখন ডালে নুন দিতে পানে চুন দিতে ভুল হয়ে যায়—কেতু নামক পদার্থের উপর এর মূল দায়িত্ব চাপিয়ে কপালে করাঘাত করার মতো এত বড় দুর্বলতা আর কি হতে পারে। অথচ এদিকে সামান্য বাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে দেবতার কাছে অপরাধ হচ্ছে মনকে পদে পদে পীড়িত করতে থাকে।

গ্রহই যদি অপরাধ ঘটায় তবে দেবতার সঙ্গে অপদেবতার লড়াই হোক না কেন, মাঝ থেকে মানুষ কেন পায় শাস্তি? যদি বল, পুরুষকারের জোরে গ্রহফল লঙ্ঘন হয় তাহলে গ্রহটাকে হিসাব থেকে বাদ দিয়ে রাখলেই তো পুরুষকার পুরো পরিমাণে জোর পেতে পারে? দেশে চারিদিকে তোমার শত্রু আছে, ম্যালেরিয়া, মূর্খতা, গোঁড়ামি, নিরুদ্যম, পরস্পর ঈর্ষা, কলহ, নিন্দুকতা, মূঢ়ের আত্মাভিমান, আরও কত কি—এর সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে বুদ্ধির দ্বারা। এর উপরে পঞ্জিকাবিহারী শত্রুভয় আর বাড়াও কেন? যে দেশের হাড়ে মজ্জায় নানা আকারে ভয় ঢুকে চিত্তকে ঘুণে খাওয়া করে দিয়েছে,—এমন সব ভয় যার অস্ত্র নেই, যেখানে যুক্তি পৌঁছয় না, সে দেশকে বাঁচাবে কে?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেতনবৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি লাভবান ভগ্নাংশমাত্র সরকারি কর্মচারী

দেবব্রত চৌধুরী

বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্ন, মধ্যবিত্ত, খেটে খাওয়া মানুষ, পর্বতপ্রমাণ বেকারদের সমস্যা জরুরী, না সাধারণ মানুষের করের টাকায় সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি? কোনটা আশু কর্তব্য এ নিয়ে আজ জনগণের মধ্যে এক অসন্তোষ মূলক প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ ভাগ বি.পি.এল, যদিও সরকার তা স্বীকার করে না। দারিদ্র্য সীমার নীচে জনসংখ্যা কম করে দেখানো হচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে কী কেন্দ্র কী রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মাইনে এখন সাধারণ মানুষের কাছে ঈর্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এক জন গ্রুপ 'ডি' কর্মী এখন তার কর্মজীবন শুরু করেন পাঁচ অঙ্কের পে-স্লিপ নিয়ে। তাই আজ সরকারি চাকুরীজীবীদের বাইরে সবস্তরের মানুষের মনে এক বিরাট প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষের বেড়ে হয় আকাশ ছোঁওয়া। হিমসিম খেতে হয় সাধারণ মানুষকে। ডাল-ভাতের যোগাড় করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের আজ প্রাণান্তকর অবস্থা। সাধারণ মানুষের কথা ভাববার দরকার বোধ করে না সরকার। তাদের খুশি করতে হবে সরকারি কর্মচারীদের। কারণ শাসনে থাকতে হলে সরকারি কর্মচারীরাই তো একমাত্র হাতিয়ার। ভোটে জেতার মন্ত্র তো ওরাই জানে। ভোটযন্ত্রের হেডমাস্টার সরকারি কর্মচারীরাই।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল'-এর নবতম সংস্করণ সরকারি কর্মচারী আর বেসরকারি কর্মচারী ও আমজনতা। শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীদের গগনচুম্বী বেতন বাড়ার কারণেই বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি—এটা বুঝতে অর্থনীতিবিদদের প্রয়োজন হয় না। জনগণের মুখের ভাত কেড়ে জনগণের অর্থ আত্মসাৎ বর্তমানে আরও কয়েকটি নতুন ডিপার্টমেন্ট তৈরি হয়েছে। তাদের খরচ এর মধ্যে ধরা হয়নি। রাজ্যের জনসংখ্যা এখন প্রায় ৮.২০ কোটি। কর্মক্ষম ২.০৫ কোটি মানুষ। তার মধ্যে সরকারি কর্মচারী মাত্র ৫ শতাংশ বা তারও কম। এদের বেতন দিতে রাজস্বের প্রায় ৫৫ শতাংশ ব্যয় করে দিতে হয়। ৯৫ শতাংশ বেসরকারি কর্মচারী বা ৯১ শতাংশ রাজ্যবাসীকে বঞ্চিত করে সরকারি এই নীতি কতটা বাস্তবসম্মত?

তার ওপর রয়েছে সরকারের বিষফোঁড়া জঙ্গলমহল। স্থানীয় মানুষদের শায়েস্তা করতে যৌথবাহিনীর জন্য খরচ প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী দৈনিক ৫০ লক্ষ টাকা। তাও জনগণের ট্যাক্সের টাকায়। সরকারি কর্মচারী কতটা নিয়মানুযায়ী জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ তাদের মুখে শোনা যায় এমন কথা—"আসি যাই মাইনে পাই।" এসব সরকারি

> **"বেতন বাড়ার পরের দিনই বাজার আগুন। সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বেড়ে হয় আকাশ ছোঁওয়া। হিমসিম খেতে হয় সাধারণ মানুষকে। ডাল-ভাতের যোগাড় করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের আজ প্রাণান্তকর অবস্থা। সাধারণ মানুষের কথা ভাববার দরকার বোধ করে না সরকার।"**

ট্যাক্সের টাকায় সরকারি কর্মচারীদের বিশাল মাইনে কেন দেওয়া হবে? সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির সময় পে কমিশন 'প্রাইস ইনডেক্স'-এর এক অজুহাত দাঁড় করায়। এই প্রাইস ইনডেক্স স্থির হয় জিনিসপত্রের বাজার দর পর্যালোচনা করে। কিন্তু একই বাজার থেকে সাধারণ মানুষ ও সরকারি কর্মচারীরা একই দামে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনেন। সেক্ষেত্রে তাদের বেতন বৃদ্ধি জরুরী কেন?

"গরমকালে পুকুরের জল শুকিয়ে হয় পাঁক, ওই পাঁকে কিলবিল করে পুকুরের ব্যাঙগুলি, খেলাচ্ছলে পুকুরের পাড়ে কিশোর বালকগুলি এক একটা ব্যাঙকে মেরেই চলেছে। অনেকগুলি ব্যাঙের মৃত্যু ঘটল। শেষে সবচেয়ে বয়স্ক বৃদ্ধ ব্যাঙটি বালকদের উদ্দেশ্যে বলল, ওহে বালকগণ, তোমরা এমন নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ কর। তোমাদের যাহা খেলা আমাদের তাহা মরণ।" সরকারি কর্মচারীদের ক্রমাগত মাইনে বাড়ানো দেখে বেসরকারি কর্মী সাধারণ মধ্যবিত্ত দরিদ্র বেকার মানুষেরা এই কথাই বলছে—ওহে সরকার, দয়া করে এখন নিঠুর খেলা বন্ধ করুন। আপনাদের যাহা খেলা আমজনতার তাহা মৃত্যু। রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র যখন জানিয়ে দেয় সরকারি কর্মচারীদের পে-কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী বেতন বাড়ানো হল বা সরকারি কর্মচারীদের আরও একপ্রস্থ মহার্ঘভাতা বাড়ানো হল, বেতন বাড়ার পরের দিনই বাজার আগুন। সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম করে সরকারের আপনজন সরকারি কর্মচারীদের খুশি রাখতেই হবে, নইলে গদী রাখা দায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বলেছে, তোমার আয় হওয়া উচিত তোমার জুতার মতো। খুব বেশি টাইট অথবা লুজ হলেই অস্বস্তি। চাণক্য আরও বলেছেন, যখন শত্রু বা অশান্তির মধ্যে পড়বে, তখন বদমাইশ বা সমাজবিরোধীদের কিছু সুবিধা দিয়ে বশংবদ বাহিনী তৈরি করবে, তারাই তোমাকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী এসব জানেন!

বিভিন্ন উপায়ে রাজ্য সরকার প্রতি মাসে যে রাজস্ব আদায় করে তার প্রায় সিংহভাগই সরকারি কর্মচারীদের মাইনে দিতে ব্যয় হয়ে যায়। রাজ্য সরকারের মোট ৪৭টি বিভাগে কর্মচারীর সংখ্যা ৩৯৫২০৩জন। রাজ্য সরকারের পেনশন বিভাগ থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, মোট পেনসনার ২১৫০০০ জন (সরকারি কর্মচারী), স্কুল শিক্ষক ২২২০০০ জন, পঞ্চায়েত কর্মী ৫৬১৮ জন, মিউনিসিপ্যালিটি কর্মী ৩৫০০ জন। এসব সরকারি কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মাইনে ও পেনসন দিতে রাজ্য সরকারের কত ব্যয় হয়—রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তর থেকে প্রকাশিত বাজেট ২০০৯-১০-এ বলা হয়েছে। বেতন ও পেনসন খাতে ব্যয় (১) টোটাল স্যালারি ২১০১৩.৪৮ কোটি টাকা, (২) পেনসন এবং রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট-৮৯৯১.২৪ কোটি টাকা, (৩) সাবসিডিয়ারি—৪৫৩.০২ কোটি টাকা।

সরকারের ৪৭টি ডিপার্টমেন্ট ছাড়াও কর্মচারীদের জন্য বছর বছর মাইনে বাড়বে আর বাজারে দর আকাশচুম্বি হবে। সাধারণ মানুষজনের কথা সরকার একবারও ভেবে দেখছে না। আবার সরকারি কর্মচারীদের অনেকেই পদাধিকার বলে নিয়মিত ভাবে গরীব জনসাধারণের কাছ থেকে ঘুষ খান। সরকারি কর্মচারী হিসেবে ভাল বেতন পান, তবুও ঘুষ নেন। চারিদিকে এত বেকার। সরকারি কর্মচারীরা হলো 'সফিস্টিকেটেড বেগার'। কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টে এ দেশে শতকরা ৭৭ জন মানুষের আয় প্রতিদিন মাত্র ২০ টাকা, মাসে ৬০০ টাকা। সেই দেশে শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারী হবার কারণে বিশাল বেতন পাবেন—এখন সেটা ভাববার দিন এসে গেছে।

সাচার রিপোর্ট ঃ ভোটব্যাঙ্কের হাতিয়ার

রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

দেশে কংগ্রেসের সপক্ষে স্থায়ী মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য সাচার কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। এটি একটি চরম সাম্প্রদায়িকতার কাজ। সাচার কমিটি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের কিছু পরিসংখ্যান সরবরাহ করেছে মাত্র। কিন্তু পরিসংখ্যান হলো সাঁতারুর পোষাক পরা একটি যুবতী, যার পোষাক সব কিছুই প্রদর্শন করে কিন্তু গোপন করে আসল ব্যাপার। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে ভারতের অন্য জায়গার মুসলমানদের চেয়ে পিছিয়ে আছে, সাচার কমিটির রিপোর্টে এইটুকুই দেখানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের উৎস বিচার করে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। সারা ভারতের মুসলমান আর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের উৎস এক নয়। ১৮৭২ খৃস্টাব্দের প্রথম জনগণনার প্রতিবেদন সারা ভারতের মানুষদের চমকিত করে দেয়। মুসলিম আক্রমণের সিংহদুয়ার থেকে দূরে অবস্থিত বঙ্গদেশের পূর্বাংশে বিপুল পরিমাণ গ্রামীণ মুসলমানদের উপস্থিতি প্রমাণ করে ওই জনগণনা। দেখা যায়, প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান ডিভিশনে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও বঙ্গদেশের ৪০ শতাংশ মানুষই মুসলমান। জনগণনা আধিকারিকরা বললেন, এই মুসলমানরা আদিতে ছিল নিম্নবর্গের হিন্দু, ধর্মান্তরকরণ মূলত হয়েছে মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা এবং কৌশলী উপায়ে। জনগণনায় দেখা যায়, বাঙলা ও পাঞ্জাব ছাড়া ভারতের অন্যান্য স্থানে মুসলিমরা মূলত শহুরে, বিভিন্ন শহর ও গঞ্জে তাদের বাস। সুতরাং সারা ভারতের মুসলিম ও বঙ্গের মুসলিম এক নয়। বঙ্গের নব্য মুসলিমরা কৃষিকেই তাদের জীবিকা মেনে নেয়। ষোড়শ শতাব্দীর মুসলিম কবি, সংস্কারক ও পীর সৈয়দ সুলতান বলেন, পৃথিবীর আদি মানুষ আদম ছিলেন কৃষিজীবী, সুতরাং, মুসলমানরা যেন কৃষিকেই তাদের জীবিকা করে নেন। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা এই সাধারণ আদলের বাইরে নয়। তারাও মূলত গ্রামীণ ও নিম্নবর্গের হিন্দুদের থেকে ধর্মান্তরিত। সুতরাং তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক উচ্চবর্ণের হিন্দুদের থেকে কম। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা অবশিষ্ট ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে চাকরি বা শিক্ষার ব্যাপারে তুলনীয় নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা আজও মূলত কৃষিজীবী। শতাংশের তুলনায় তাদের হাতে কৃষিজমি বেশি। সাচার কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গ্রামীণ বঙ্গবাসীর ২৯.২ শতাংশ মুসলমান (মোট মুসলিম ২৫.২ শতাংশ), শহুরে বঙ্গবাসীর ১৫.১ শতাংশ মুসলিম (Appendix এর ১.২ ও ১.৩গ্ন। সুতরাং তাদের তুলনা করতে হবে বঙ্গের তফশিলী জাতিদের সঙ্গে। আজকে যাদের তফশিলী জাতি বলে দেখছি, তাদেরই একটা অংশ একদা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এখানেও স্মরণ রাখতে হবে হিন্দু তফশিলীরা সংরক্ষণের সুযোগ পায়, মুসলমানরা পায় না। বিনা সংরক্ষণেই তারা তপশিলী জাতিদের সমান অগ্রসর। এছাড়া মনে রাখতে হবে দেশভাগের সময় সরকারি চাকুরিজীবী ও শিক্ষক মুসলমানদের একটা বিশাল অংশ পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান। ধনী আশ্রফ মুসলমানরাও সম্পত্তি বিক্রি করে চলে যান পাকিস্তানে। সম্পত্তি বিনিময় করেন বহু মুসলমান। আবুল হাসিম, সোহরাবর্দীরা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গেরই মানুষ। ফলত দেশভাগের ফলে মধ্যবিত্ত মুসলমানরা প্রায় অদৃশ্য হন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু যারা তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গীয়দের থেকেও শিক্ষায় অগ্রসর। সুতরাং আজকের পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের পরিসংখ্যানগত ভাবে উচ্চজাতির হিন্দুদের সঙ্গে চাকুরিগত অবস্থান দেখিয়ে তাদের বঞ্চিত বলে প্রমাণ করা নিতান্তই তঞ্চকতা।

দলীয় ইস্তাহারে 'সাচার'

সাচার কমিটির রিপোর্ট নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে সরব হয়েছে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস এবং কিছু বিকৃতমস্তিষ্ক বাঙালি বুদ্ধিজীবী। গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হয়েছে : ''সাচার কমিটির রিপোর্টে প্রমাণিত হয়েছে এরাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকাংশই চরম দারিদ্র্য, শিক্ষাহীনতা ও অনগ্রসরতার শিকার। অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থাও তথৈবচ। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নে আইনি ও সাংবিধানিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত এই বিপুল সংখ্যক মানুষ। সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নটিও গভীরভাবে ভাবাচ্ছে তাদের। এইসব পশ্চাদপদ অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের উন্নয়নের প্রশ্নে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ রাজ্য সরকার।

''আমাদের রাজ্যে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। সাচার কমিটির রিপোর্টে এই রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এ রাজ্যের সিপিএম শাসিত বামফ্রন্ট সরকার শুধুমাত্র ভোটের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে কিন্তু তাদের জীবনের মানোন্নয়নের জন্য কোনও ব্যবস্থাই নেয় না। তারা এই রাজ্যে দেশের অন্য রাজ্যের তুলনায় আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষা, প্রায় সব ক্ষেত্রেই বঞ্চিত তদের দলে, এ কথার স্বীকৃতিও মেলে মানব উন্নয়ন রিপোর্ট, সাচার কমিটির রিপোর্টে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এই

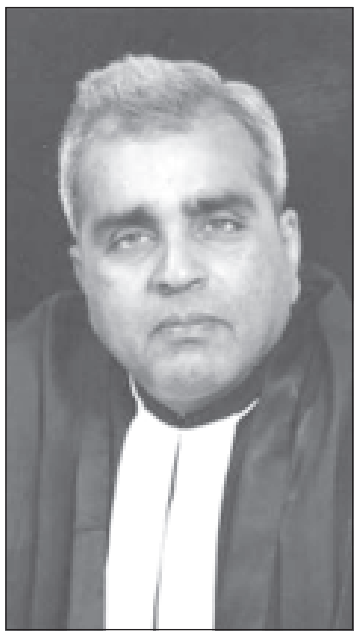

বিচারপতি রাজিন্দর সাচার

অবহেলা দূরীকরণে 'বিশেষ আর্থিক তহবিল' গঠন করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে সাচার কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে হবে এবং তফশিলী জাতি-জনজাতি, আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের প্রকৃত উন্নয়নে সরকারকে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ২৭ শতাংশ হলেও সংখ্যালঘুদের চাকরির সুযোগ শুধুমাত্র ২ শতাংশের কাছাকাছি। সংখ্যালঘুদের জীবনে ৩২ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে শুধু চলেছে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা। তাই এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন আছে। সংখ্যালঘুদের সামাজিক নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া। চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের, মেয়েদের ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের অগ্রাধিকার বিশেষ গুরুত্ব পাবে ও কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেবে। মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন, আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাতেও সরকারি অনুদান, উর্দু স্কুল ও উর্দু কলেজ তৈরি করবার ব্যবস্থা ও উর্দু ভাষার মানোন্নয়ন করতে হবে। উর্দুভাষী মানুষ যে সব অঞ্চলে সংখ্যাধিক্য (অন্ততঃ ১০ শতাংশ) সেই সব অঞ্চলে উর্দু ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গণ্য করতে হবে।''....

''সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণা করা উচিত। তাদের সোসাল সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা দরকার। সংখ্যালঘুদের চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের দাবী রাখছে তৃণমূল কংগ্রেস।''

এখন তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার নিয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার। যারা মানসিকভাবে সুস্থ তারা স্বীকার করবেন, কোনও পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতম মানুষকেই নির্বাচিত করা উচিত। অন্যথায় দেশ ও সমাজ পিছিয়ে পড়বে। সব দেশেই পরীক্ষার ফলের নিরীখে কে কী পড়বে, কে কোন চাকরি করবে স্থির হয়। জাতি-ধর্মের বিচারে কে ডাক্তারী পড়বে, কে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে, কে পদার্থবিদ্যায় অনার্স পড়বে তা স্থির করা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। এতে দেশ ও সমাজ পিছিয়ে পড়ে। প্রতিভাবান মানুষ, যে কঠোর পরিশ্রমে কোনও একটি কর্মে যোগ্যতা অর্জন করেছে, সে বেকার হয়ে বসে থাকবে, আর তার চেয়ে অনেক কম মেধার একজন, তার ধর্মের বা জাতের নিরীখে সেই পদে নির্বাচিত হবে, এটা সুস্থ সমাজের লক্ষণ নয়। এর ফলে প্রতিভাবানদের মনে বঞ্চনার হাহাকার জেগে উঠবে।

কী ধরনের কুসংস্কারবশত মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা পরিহার করে এসেছে তার বিবরণ রেখেছেন মীর মশারফ হোসেন। মশারফের আত্মীয়-স্বজন ও মাতামহীর ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা ছিল এইরকম:

ইংরেজী পড়িলে ত পাপ আছেই, আর মরিবার সময় গিডীমিডী করিয়া মরিতে হইবে। আল্লার-রসুলের নাম মুখে আসিবে না।...ইংরেজী পড়িলেই, এইরূপ ছোটখাট শয়তান হয়। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে। সরাব খায়।...হালাল-হারামে প্রভেদ নাই। পাক না-পাকে জ্ঞান থাকে না। মাথার চুল খাটো করিয়া নানভাবে ছাঁটে, সাহেবী পোষাক পরে। ছুরিকাঁটায় খাইতে চায়। নামাজ রোজায় ভক্তি করে না। আদব-তমিজের ধার ধারে না। স্বভাবও যেন একটু উদ্ধত ভাব ধারণ করে। নম্রতার নামগন্ধ থাকে না...মাতামহীর ধারণা ছেলে খৃষ্টান হইয়া মেম বিয়ে করিবে। মরিবার সময় ইংরেজী কথা বলিয়া মরিবে। খোদা-রসুলের নাম করিবে না। মুসলমান ধর্মের প্রতি বিশ্বাস থাকিবে না।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, কী করে ১৯৪৭-এ মুসলমান সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা ১৭ শতাংশ হয়েছিল। সেটা কখনই মুসলমানদের মেধার নিরীখে নয়। যারা যথেষ্ট বয়স্ক মানুষ তারা জানেন, দেশভাগের আগে বাঙলায় কী ঘটতো। ১৯৪৭ সালে ভারত শাসন আইন অনুসারে যে নির্বাচন হয় তাতে মুসলিম লীগ বাঙলায় ক্ষমতা দখল করে। তখনকার সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে যাবতীয় চাকরি শুধুমাত্র মুসলমানদেরই দেওয়া হবে। হুগলী মহসীন কলেজে একটি লেকচারারের পদ খালি হতে প্রথম শ্রেণীর এম এ হিন্দু প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও একজন তৃতীয় শ্রেণীর মুসলিম প্রার্থীকে নিযুক্ত করা হলো। বিধানসভায় এই নিয়ে প্রশ্ন উঠলে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাফ জানালেন, আমাদের ক্যাবিনেট ডিসিশন হচ্ছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমান প্রার্থী পেলে তো ভালই, না পেলে তৃতীয় শ্রেণীর মুসলমান প্রার্থীকেই চাকরিটি দেওয়া হবে। সে আমলে যোগ্য হিন্দুদের চাকরি পাওয়া যে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল তা তপন রায়চৌধুরীর মতো হিন্দুবিদ্বেষী ঐতিহাসিকও স্বীকার করেছেন।

সুতরাং ১৯৪৭ সালে যে ১৭ শতাংশ মুসলমান সরকারি কর্মচারীর কথা হচ্ছে তা মেধাভিত্তিক নয়, জল মেশানো। সুতরাং স্বাধীন ভারতে তারা উচ্চমেধার পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুর সম্মুখীন হয়ে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠলো না পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা। উপরন্তু দেশভাগের পরে সরকারি চাকুরেদের বিনিময় ঘটলো, তাতে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এলো হিন্দু কর্মচারীরা, পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলে গেল মুসলমান কর্মচারীরা। পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে হিন্দু উদ্বাস্তু আসার ফলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের মধ্যে হিন্দুর অনুপাতও প্রবলভাবে বেড়ে গেল। তা প্রতিফলিত হলো সরকারি চাকুরেদের সংখ্যাতেও। সিপিএম সরকার কিছু কম মুসলিম তোষক নয়। মুসলমানদের পছন্দসই মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য সিপিএম সরকার প্রচুর টাকা ঢেলেছে এবং ঢালছে। এতো টাকা ঢালছে যে সে টাকা খরচ করার মতো পরিকাঠামোই নেই মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের।

তাহলে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও মুসলমানদের সিপিএম সরকারের প্রতি এই অসত্য অভিযোগের আঙ্গুল তোলার উদ্দেশ্য কী?

মুসলমানদের উদ্দেশ্য নিম্নমেধার হয়েও ধর্মের জিগির তুলে সংরক্ষণের মাধ্যমে ২৭ শতাংশ আসন শিক্ষাক্ষেত্রে ও চাকরিক্ষেত্রে আদায় করা। আর কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য যোগ্যতাসম্পন্ন হিন্দুধারার ছাত্রদের বঞ্চিত করে মুসলমান ও খৃস্টানদের সবকিছু পাইয়ে দেওয়া। তাতে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি হয়ে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা যেমন বরাবরের জন্য করায়ত্ত থাকবে একদিকে, অন্যদিকে নেত্রীদের নিজস্ব সাম্প্রদায়িক স্বার্থও চরিতার্থ হবে।

মুসলমানদের গোষ্ঠীচেতনা এতই প্রখর যে তা দলীয় মনোভাবকে মূল্য দেয় না। ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী আবদুর রেজ্জাক মোল্লা পর্যন্ত বলেছেন মমতা যদি রেলে ৩০ শতাংশ মুসলমানদের চাকরি দিতে পারেন তা হলে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেবেন। এটা নিছক কথার কথা নয়। একেবারে মনের কথা।

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের স্বার্থে কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেসের এই মুসলিম তোষণ ভারত রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও ভারতের কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন মন্দির সভ্যতার পক্ষে বিপজ্জনক। আমাদের ভুললে চলবে না, বহু শতাব্দী ধরে আমরা মুসলিম শাসনের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছি। ব্যাপক তোষণের দ্বারা তুষ্ট সম্প্রদায় বেপরোয়া হয়ে এখনই গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর চড়াও হচ্ছে। ভবিষ্যতে সংরক্ষণ দ্বারা অস্বাভাবিক ক্ষমতা আহরণ করলে আক্রমণের মাত্রা লাগামছাড়া হয়ে যাবে। তখন ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হবে দেশজুড়ে। সুতরাং, দেশ ও জাতির সুরক্ষার স্বার্থে সাচার কমিটির রিপোর্টের কু-ব্যাখ্যা ও অকারণ মুসলিম তোষণ বন্ধ করতেই হবে।

রাজ্য রাজনীতি

পর্বতের মূষিক প্রসব

শুদ্ধিকরণ আলোচনা অসমাপ্ত

নিশাকর সোম

সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত শুদ্ধিকরণ দলিল নিয়ে রাজ্য-কমিটিতে দু'দিন আলোচনার কথা ছিল। বস্তুত অর্ধেক দিন ধরে সে-আলোচনা হল। প্রথমদিন সকালবেলা সাধারণ-সম্পাদক-এর লম্বা কেরাত। বিকেলবেলা আলোচনা। আলোচনায় উত্তাপ দেখা দিল। রাজ্য-কমিটির বিভিন্ন সদস্য রাজ্য-নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করলেন। বুদ্ধবাবু, নিরুপমবাবুরা এই সমালোচনা থেকে রেহাই পাননি। বক্তাদের সকলেই চেয়েছেন যে, শুদ্ধিকরণ উপর থেকে শুরু-হওয়া দরকার। বুদ্ধবাবুর আত্মম্ভরিতাও তো শুদ্ধিকরণের আওতায় পড়ে—এ-কথা বলা হয়। সব থেকে বেশি সরব ছিলেন দীপক সরকার, অমিয় পাত্র ও রবীন দেব। লক্ষ্মণ শেঠ-কেও সমালোচনা করা হয়—তাঁর ও তাঁর পত্নীর চালচলন, হাবভাব নিয়ে। সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাতকে বলতে হয়, পার্টি-নেতাদের পুত্র-কন্যাদের "বুর্জোয়া কায়দায়" বিবাহ বন্ধ করতে হবে। এই সভাতেই উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগণার এক নেতা, যাঁর পুত্রের বিবাহ নাকি রাজকীয় ব্যবস্থায় হয়েছিল?

আলোচনার দ্বিতীয় দিনে সকালবেলা সভা হয়নি। বিকেলবেলা বিমান বসু-বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর বক্তৃতা। বস্তুত রাজ্য-কমিটির সদস্যদের জন্য মাত্র এক বেলা আলোচনার সুযোগ ছিল।

এখন শুদ্ধিকরণ নিয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলা যাক। শুদ্ধিকরণ বা রেকটিফিকেশন ক্যাম্পেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতেই চালু হয়। চীনে একে দানফান আন্দোলন বলা হয়। শুদ্ধিকরণ সম্পর্কে চীনের নেতা মাও জে দুং বলেছিলেন—"এই শুদ্ধিকরণ আন্দোলন পরিচালনা করার সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, চিকিৎসক যেমন রোগীর রোগ সারানোর মনোভাব নিয়ে রোগী দেখে সেইভাবে। রোগীকে তাড়ানো নয়—রোগ তাড়ানো।" চীনের নেতা লিউ শাউ চি-এর পুস্তক 'ভালো কমিউনিস্ট কি করে হওয়া যায়'? বা তাঁর 'আন্তঃপার্টি সংগ্রাম' এবং সর্বোপরি মাও জে দুং-এর দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত তত্ত্ব সিপিএম বহু পূর্বেই খারিজ করে দেয়। প্রয়াত বাসবপুন্নাইয়া—মাও-এর দ্বন্দ্ব-সম্পর্কিত বই-কে গান্ধীবাদী-তত্ত্ব বলে সমালোচনা করেন। কারণ এই তত্ত্বে নাকি মাও গান্ধীর মতোই হৃদয়ের পরিবর্তনের কথা বলেছেন।

সিপিএম-এর বর্তমানে শুদ্ধিকরণের কথা উদ্দেশ্যমূলক। (১) সাধারণের মধ্যে একটা ধারণা সৃষ্টি করা পার্টি সৎ, তাই অসৎদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। (২) যখন রাজনৈতিক আদর্শগত শুদ্ধিকরণের দাবি উঠেছে পার্টির নীচের তলায়, তখন নেতারা ঘুরিয়ে নিচের তলার কর্মীদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে। (৩) উচ্চ হ্যান্টিং—পার্টির মধ্যে ডাইনি খোঁজার ব্যবস্থা করা। যে-সব কর্মী নেতাদের এবং নেতৃত্বের সমালোচক, তাঁদেরকে শুদ্ধিকরণের আওতায় এনে মাথা ন্যাড়া করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল।

বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-দের মাথায় রেখে শুদ্ধিকরণ করে খাবে কি? কারণ তাঁদের শুদ্ধ করবে কে? তাঁরা কি ধোয়া তুলসী পাতা?

সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত সংসদীয় কাজ-এর বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে পার্টি মধ্যে দোষত্রুটির কথা বলেছেন। প্রকাশ কারাতের বক্তৃতা শুনে মনে পড়িয়ে দিয়েছিল—প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর তদানীন্তন পার্টির সাধারণ-সম্পাদক অজয় ঘোষ "সাম অফ আওয়ার মিসটেকস"-শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। যেটি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ব্যারো কোমিন ফর্ম-এর মুখপত্র "ফর লাস্টিং পীস-ফর-এ পিপলস ডেমোক্রেসি"-তে প্রকাশিত হয়। সেখানে যা যা বলা হয়েছিল তাই হুবহু এখন সিপিএম নেতারা কপচাচ্ছেন।

আসলে পার্টি নির্বাচন সর্বস্ব। যেখানে নেতারা বলেন—আমার ২৩৫-ওরা ৩৫, ওদের দাবিয়ে রাখতে হবে। শুধু তাই নয় ফ্রন্টের শরিকদের পার্টিকে নিষ্ক্রিয় করে সিপিএম-এর গাধা-বোট-এ পরিণত করার হীন চেষ্টা করা হচ্ছে। এই থেকেই তো পার্টিতে দূষণ ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার একটি ইংরাজি দৈনিকে "রেড মাফিয়া" নামক একটি নিবন্ধ বেরোয়। সেই প্রবন্ধে সিপিএম-এর কয়েকজন পার্টি নেতার পুত্রদের বিরুদ্ধে নাকি কিছু কথা লেখা হয়। শোনা যায়, সেই সময়ে এই নিবন্ধের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হয়েছিল। যাঁদের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছিল—তাঁরা এখন কিরকম আর্থিক অবস্থায় আছেন? এ-সব ঘটনাতো পার্টির মধ্যে সঞ্চারিত হয় না? যখন প্রয়াত নেতা বিনয় চৌধুরী বলেছিলেন "পার্টি ফর দ্য প্রমোটার, বাই দ্য প্রমোটার, অফ দ্য প্রমোটার" তখন জ্যোতি বসু বলেছিলেন "বিনয়বাবু তবে কেন মন্ত্রিসভায় আছেন?"

প্রমোটার-রাজ তো পার্টি নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল। আর নির্বাচন জেতার জন্য ম্যাসলম্যান তো নেতাদের প্রশিক্ষণেই গড়ে উঠেছে। এখন নিচের তলার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে সতী সাজাটা শয়তানি ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন কম্বলের লোম বাছতে গেলে তো গোটা কম্বলটাই ফেলে দিতে হবে। এই কথাগুলিই রাজ্য-কমিটির সভায় উত্থাপিত হয়েছিল। তাইতো আলোচনার সময় কমিয়ে দিয়ে ব্যর্থ-নেতৃত্বের ভাঙা রেকর্ড বাজানো হয়েছে। এসবে বরফ গলবে না।

রাজ্য-কমিটির সদস্যরাও তো কলুষমুক্ত নন। তাঁদের সম্বন্ধে নিজ নিজ জেলার নেতাদের বহু কথা জমে আছে।

কমিউনিস্ট পার্টি আজ দূষিত হয়নি। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতেই দূষণ ছিল। পার্টি সম্মেলন-এ ভোট গণনায় কারচুপি হয়েছিল। শাস্তি দেওয়া হয়েছিল বেশ কয়েকজনকে। তাঁদের মধ্যে গৌতম চ্যাটার্জিও নাকি ছিলেন? আসলে কমিউনিস্টরা নীতি-নৈতিকতার ধার কোনদিনই ধারেন না। তাঁরা তো পাপ-এর কাথায় বিশ্বাস করেন না। তাই যে কোনও অনৈতিক পাপের পথে যেতে ইতস্ততও করেন না। তবে আজ এটা একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে গেছে। সাধারণ মানুষকে কোন মর্যাদা দেওয়া হয় না। নেতারা গজদন্ত মিনারে বসে কর্মীদের উপর হুকুমদারি চালায়। কর্মীরা সব আজ্ঞাবহ বরকন্দাজ-সিপাই মাত্র। সবই মৃত সৈনিকের ভূমিকায় আছেন?

পার্টিতে সব সময়েই দু'রকমের মানদণ্ড চালু ছিল। নেতাদের প্রিয়পাত্র-পাত্রীদের অনৈতিক কাজ—পরের স্ত্রীকে ফুঁসলিয়ে বিয়ে করা, নিজের কাকিমাকে বিয়ে করা, সৎমাকে বিয়ে করা, বৌদিকে বিয়ে করা—এসব মঞ্জুর করা হয়েছিল। কারণ এঁরা পার্টি নেতাদের "ব্লু-আইড"। আর এক মহিলার কথায় ডাঃ হৈমি বসুকে পার্টি বহিষ্কার করে দিয়ে বিরুদ্ধ দলে ঠেলে দিয়েছিল। এ পার্টির ভালো হতে পারে না। সুভাষ চক্রবর্তী সমালোচনা করে রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীতে স্থান পান অথবা পীযূষ দাশগুপ্ত সমালোচনা করে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

একটি ঘটনা যুগান্তর পত্রিকার একজন প্রাক্তন সাংবাদিক আমায় বলেছিলেন।সেই ঘটনার সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ হয়নি। সে-ঘটনা হলো, মুর্শিদাবাদের লালগোলাধিপতির পুত্র বীরেন রায় সিপিএম-বিধায়ক ছিলেন। তাঁর ভগিনীকে সোমনাথ চ্যাটার্জি বিবাহ করেন। শোনা যায় সম্পত্তি নিয়ে ভ্রাতা-ভগিনীর নাকি মামলা হয়েছিল?

মেনকা গান্ধী সম্পাদিত একটি ইংরাজি সাপ্তাহিকে জ্যোতি বসুর সঙ্গে নৃত্যরতা এক রমণীর ছবি ছাপা হয়। এই ছবিটি দু'বার প্রকাশিত হয়। এ-সম্পর্কে তদানীন্তন রাজ্য-সভার সদস্য এবং আইনজীবী অরুণ প্রকাশ চ্যাটার্জি জ্যোতি বসুকে মামলা করতে বলায় তাঁকে সিপিএম থেকে বহিষ্কার করা হয়—তিনি সিপিআই-তে চলে যান।

এতো কথা লিখলাম। পাঠক ক্ষমা করবেন, 'ধান ভানতে শিবের গীত'। আমার বলার উদ্দেশ্য হল পূতিগন্ধময় আদর্শের নামাবলী গায়ে দিয়ে সৎ, সাধু, সজ্জন হওয়া যায় না।

শেষমেশ রাজ্য-কমিটিতে শুদ্ধিকরণ দলিল নিয়ে আবার আলোচনা হবে। রাজ্য-কমিটির কোনও সদস্যের সাহস হয়নি বুদ্ধ-নিরুপম-বিমান-কে হটিয়ে দেবার দাবি তোলার। দাবি ওঠেনি পার্টি-সম্মেলনের। নপুংসকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মরতে হলে মরবেন নিচের তলার কর্মীরা! আসলে সবাইকে ছেড়ে নিচের তলাকে ধর। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

বিমান বসু

প্রকাশ কারাত

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

নিরুপম সেন

অ রকম

পাইলট ও পোলিও

তাঁর নাম গৌতম লিউইস। বিলেত-নিবাসী এই ভদ্রলোক-এর একটি পাইলটের লাইসেন্স রয়েছে। তাঁকে প্রত্যেকটি পোলিও-রবিবারে দেখতে পাবেন কলকাতায়। তবে ইনিও যে পোলিও আক্রান্ত এবং এখনও পুরোপুরি সারেননি তা অবশ্য গৌতমবাবুকে একঝলক দেখে বোঝার উপায় নেই। পাঠকগণ আপনারা ঠিকই পড়ছেন। একদা পোলিও আক্রান্ত, এখনও পুরোপুরি না সারা এই গৌতম লিউইসই একজন পাইলট।

এখনই চূড়ান্ত বিস্মিত হবেন না। কারণ আরও বিস্ময় অপেক্ষা করে রয়েছে। গৌতমবাবুর জন্ম গঙ্গার পশ্চিমকূল হাওড়া জেলায়। ছেলেবেলাটা তাই হাওড়া-কলকাতা করেই কেটেছে। জন্মাবধি পোলিও-র দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন তিনি। ঠাঁই হয় একটি অনাথ আশ্রমে। পরিবার কর্তৃক বিতাড়নের সেই নিষ্ঠুর অভিঘাত মনোবল বাড়িয়ে তুলল গৌতমের। কথায় আছে—'ফরচুন ফেভার দি ব্রেভস্'। তাই শেষ পর্যন্ত জয় হলো পুরুষসিংহেরই। এক ভদ্রমহিলার দত্তক পুত্র হিসেবে গৌতম পাড়ি জমালেন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে, অর্থাৎ বিলেতে।

আস্তে আস্তে চিকিৎসা শুরু হলো তাঁর। ধীরে ধীরে সেরে উঠতে লাগলেন

গৌতম লিউইস

তিনি। এখন তাঁর বয়স ৩১ বছর। তবে জীবনের এই কটা বছর জবুথবু হয়ে বসে থাকার চেষ্টা করেননি ওই যুবক। বিলেতে একটি নাইট ক্লাবের পরিচালনা থেকে ব্যাণ্ড ম্যানেজারের সবই করার চেষ্টা করেছেন তিনি। তবে শুধু কিছু করার জন্য বা হিম্মত দেখানোর জন্যই নিজের আদর্শবিরোধী কোনও পেশাকে গ্রহণ করার ঘোরতর বিরোধী তিনি। সেই কারণেই নাইটক্লাবের ম্যানেজারি ছেড়ে পাইলট হওয়ার শিক্ষা নিতে থাকেন।

এখনও তাঁর হাত যথেষ্ট সাবলীল হয়নি, বরঞ্চ বলা ভালো হাতের আঙুলগুলো বেশ বেঁকে রয়েছে। এমতাবস্থাতেও তিনি পাইলট ট্রেনিং-এ সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এমনকী লন্ডনে একটি ফ্লাইট ট্রেনিং স্কুলে এখন পড়াচ্ছেনও গৌতমবাবু।

কিন্তু শৈশবের তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি কখনই ভুলে যাননি গৌতম লিউইস। তিনি চান না আর কোনও শিশু তাঁর মতো পোলিওতে আক্রান্ত হোক। তাই প্রত্যেকটি পোলিও রবিবার বাচ্চাদের ও তাদের বাবা-মাকে উৎসাহ দিতে শত ব্যস্ততার মধ্যেও কলকাতায় পদার্পণ করেন তিনি।

উলফা'র সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক অসমের স্বপ্ন চুরমার হচ্ছে

বাসুদেব পাল ॥ ঢাকা ও নিউ দিল্লীতে টানটান উত্তেজনা। কারণ উলফা'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অরবিন্দ রাজখোয়াকে ঢাকা ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে। যদিও ভারত-বাংলাদেশ বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তিই নেই। সেই চুক্তি নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা। আগামী ১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরে আসছেন।

নভেম্বর মাসের গোড়াতেই এরকমই আর একটা ঘটনা ঘটে গেছে। উলফার কেন্দ্রীয় দুই নেতাকে বাংলাদেশ ধরে ত্রিপুরা সীমান্তে ছেড়ে দেয়। তখনই আগের থেকে অবহিত থাকার ফলে বি এস এফ শশধর চৌধুরী ও চিত্রবন হাজারিকাকে গ্রেপ্তার করে। এই নভেম্বরে দুজনকেই গুয়াহাটিতে কোর্টে তোলার পর সেফ কাস্টডিতে রয়েছেন।

আগামী দু-চার দিনের মধ্যেই রাজখোয়াকে আদালতে তোলা হবে। সংবাদসূত্রে প্রকাশ, অরবিন্দ রাজখোয়া উলফা (ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম)-র সভাপতি, তাঁকে খুব সহজেই ধরা গিয়েছে, এটা তারপক্ষে অমর্যাদাকর। সেজন্য তিনি ভারত সরকারের কাছে 'সেফ প্যাসেজ'-এর বায়না ধরেছেন। এর আইনগত ঝামেলাটা মেটাতে সময় লাগছে। ওদিকে কমাণ্ডার ইন চীফ্ অর্থাৎ উলফার সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পরেশ বরুয়া সূত্রমতে বাংলাদেশে থাকা নিরাপদ নয় টের পেয়েই চীন বা মায়ানমারে পাড়ি দিয়েছেন। ক'বছর আগে উলফার আরও দুই কেন্দ্রীয় নেতা প্রদীপ গগৈ এবং প্রণতি ডেকা ধরা পড়েছিল। তারাও সেফ কাস্টডিতে থেকেই সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক শান্তি আলোচনা চাইছেন। শান্তিবার্তার পক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। এদিকে অসম থেকে জানা গেছে বন্দী উলফা ক্যাডারদের বাড়ির লোকেরা যে সব নেতারা বাইরে রয়েছে তাদেরকেও সেফ প্যাসেজ দিয়ে ভারতে এনে আলোচনায় বসার সুযোগ দিতে হবে। ওদিকে তরুণ গগৈ (অসমের মুখ্যমন্ত্রী) আলোচনায় সার্বভৌম অসমের দাবী বাদ দিলেই যে কোনও সময়ে সরকার-উলফা শান্তিবার্তায় রাজী। নিশ্চিত খবরও রয়েছে যে কেন্দ্র সরকার তাদের আলোচনায় বসার ব্যাপারে কথা বলার জন্যে (রাজী করানো একজন সিনিয়র অফিসার নিয়োগ করেছে। তিনি গুয়াহাটিতে থেকে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। এমনও শোনা যাচ্ছে যে, কট্টরবাদী পরেশ বরুয়াই নাকি অরবিন্দ রাজখোয়াকে যাবতীয় নির্দেশ দিয়েছেন। সেটাই হচ্ছে। বস্তুতপক্ষে অরবিন্দ রাজখোয়া এবং পরেশ বরুয়া উলফার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম।

বাংলাদেশে উলফা ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ শিবির।

১৯৭৯ সালের ৭ এপ্রিল শিবসাগর জেলার রংঘরে ভীমকান্ত বরগোহাঞি, রাজীব রাজকোনয়ার ওরফে অরবিন্দ রাজখোয়া, গোলাপ বরুয়া ওরফে অনুপ চেতিয়া, সমীরণ গগৈ ওরফে প্রদীপ গগৈ, ভদ্রেশ্বর গোহাঞি এবং পরেশ বরুয়া মিলে উলফা অর্থাৎ 'ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম' প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় তারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 'সার্বভৌম এবং সমাজতান্ত্রিক অসম' গঠনের শপথ নিয়েছিলেন বলা যায়। উলফা'র চেয়ারম্যান হন অরবিন্দ রাজখোয়া, সহ-সভাপতি প্রদীপ গগৈ। প্রদীপ গগৈ বিগত ১৯৯৮ সালের ৮ এপ্রিল ধরা পড়ে এখন গুয়াহাটির বিচার বিভাগীয় হেফাজতে। তিনিও শান্তি আলোচনার পক্ষপাতী। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ভীমকান্ত বরগোহাঞি হন মূল তাত্ত্বিক নেতা। প্রচার সচিব মিথিঙ্গা দৈমারি এবং বলিন দাস সহ-সম্পাদক। এছাড়া প্রণতি ডেকা সাংস্কৃতিক সম্পাদক।

২০০৩ সালে ভূটানে অপারেশন চলাকালে মিথিঙ্গা ধরা পড়ে সেফ্ কাস্টডিতে। প্রণতিও মেঘালয়ের পশ্চিম গারো হিলসের ফুলবাড়ি থেকে ধরা পড়ে বন্দীজীবন কাটাচ্ছে। সাংগঠনিক দৃষ্টিতে উলফা অসমকে চারটি জোনে ভাগ করে সংগঠন বিস্তার করে।

১৯৯৬ সালে উলফার সামরিক শাখা গঠিত হয়, ১৬ মার্চ। নাম দেওয়া হয় সংযুক্ত মুক্তি ফৌজ। পুরোদস্তুর তিনটি সামরিক ব্যাটেলিয়ন—সপ্তম, ২৮নং এবং ৭০৯নং ব্যাটেলিয়ন। বাকী যে সকল ব্যাটেলিয়নের নাম শোনা যায় তার সবই খাতায়।

৭ম ব্যাটালিয়ন—(হেডকোয়ার্টার সুখনি-তে)। দায়িত্ব সরকারি হেড-কোয়ার্টারের রক্ষণাবেক্ষণ করা। ৮ম ব্যাটেলিয়ন নওগাঁ, মরিগাঁও, কার্বি আংলং-এ সক্রিয়। নবম ব্যাটেলিয়ন গোলাঘাট, জোড়হাট, এবং শিবসাগর জেলায় সক্রিয়। একাদশ ব্যাটেলিয়ন কামরূপ এবং নলবাড়িতে সক্রিয়। অসমে যে সর্বশেষ হয়েছে নলবাড়ি জেলাতেই। চার জায়গায় বিস্ফোরণে আট জন নিহত এবং আহত অনেক বেশি। ২৭নং ব্যাটলিয়ন বরপেটা, বনগাঁইগাঁও এবং কোকরাঝাড় জেলার দায়িত্বে রয়েছে। ২৮নং ব্যাটেলিয়ন রয়েছে তিনসুকিয়া ও ডিব্রুগড়ের চার্জে, ৭০৯নং ব্যাটেলিয়ন কালিখোলার দায়িত্ব নিয়েছে।

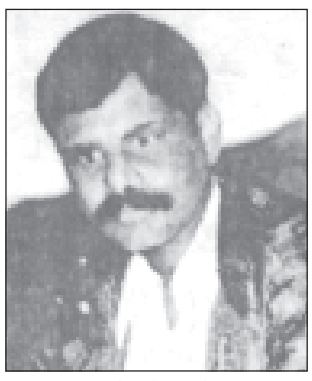

পরেশ বড়ুয়া

অরবিন্দ রাজখোয়া

নববই-এর দশকেই উলফা ভারত-ভূটান সীমান্তের জঙ্গলে শিবির স্থাপন করে ভালোমতো ঘাঁটি গাড়ে। তারা সুসম্পর্ক স্থাপন করে রয়্যাল ভূটান আর্মি এবং ভূটান পুলিশের সঙ্গে। ভূটান উলফা-দের অর্থসাহায্য, দ্রুত রেশন পৌঁছানো থেকে শুরু করে সবরকম নৈতিক সমর্থন দেয়। সূত্রে মতে ভূটানের ঘাঁটিতে উলফার শক্তি অর্থাৎ সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ক্যাডারদের সংখ্যা ২০০০-এ পৌঁছে ছিল। মোট ১৩টি শিবির সে সময়ে স্থাপিত হয়েছিল। তারমধ্যে প্রশিক্ষণ শিবির, জেনারেল হেডকোয়ার্টার, কাউন্সিল হেডকোয়ার্টার ছাড়াও বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে একটি আপাত নিরীহ গোছের ফাঁকা পরিত্যক্ত শিবিরকেও দেখানো হোত। ওই ১৩টি শিবির স্থানের নাম—মিথুনদ্রা, গোবরকুণ্ডা, পানবাং, দিয়াজিমা, পেমাগাটসেল, নাকার, চাইবাড়ি, মারথং, গেরোয়া, সুখনি (প্রধান কার্যালয়), মেলাং, ফুকাপটং, ডালিম-কোইপানি এবং নেওলি দেবারলি।

দক্ষিণ ভূটান থেকে অসমের নলবাড়ি পর্যন্ত লাইন ধরে উলফার শিবির সব বহাল তবিয়তে চালু ছিল ২০০৩-এ সেনাবাহিনী আসরে নামা অবধি। তবে এসবই দুর্বল ভারত সরকারের দুর্বল ভূটান-বাংলাদেশ পলিসির ফলশ্রুতি বলা যেতে পারে।

১৯৮৬ সালে উলফারা ততদিন পর্যন্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এন এস সি এন (নাগাল্যাণ্ডের ন্যাশন্যাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অফ্ নাগালিম্) এবং তার অল্প কিছু দিনের মধ্যে মায়ানমারের কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স আর্মি-র কাছে অস্ত্রশস্ত্র এবং সশস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য যোগাযোগ গড়ে তোলে। নাগা জঙ্গিদের সূত্র ধরেই উলফারা কাচিন বিদ্রোহীদের কাছে পৌঁছায়। কে আই এ-দের কাছ থেকে সন্ত্রাসী-জঙ্গিবাদের কায়দা কানুনের বিস্তৃত প্রশিক্ষণ নেয় উলফা ক্যাডাররা। কাচিন বিদ্রোহীরা ক্যাডারপিছু এক লক্ষ টাকা করে নিত বলে জানা গেছে।

এরপর ধীরে ধীরে উলফা জঙ্গিরা পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই এবং আফগান মুজাহিদিনদের সঙ্গেও যোগাযোগ গড়ে তোলে। সংবাদে প্রকাশ কমপক্ষে ২০০ উলফা ক্যাডার পাক-আফগান সীমান্তে মুজাহিদিনদের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। গত ১/২ বছরে ধৃত উলফা ক্যাডারদের জেরা করে এর সত্যতা জানা গিয়েছে। আর বাংলাদেশের সিলেট জেলাতে বাংলাদেশ-সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা শাখা 'ডিফেন্স ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স'ও উলফা ক্যাডারদের রীতিমতো প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রসঙ্গত, খালেদা জিয়ার আমলেই পাকিস্তানী সামরিক গোয়েন্দা শাখা আই এস আই-এর অনুকরণে ডি এফ আই গঠিত করা হয়েছিল। তাদের একমেব ধ্যানজ্ঞান ভারতের ক্ষতিসাধন করা, ভারতের অখণ্ডতা ও ঐক্যকে ভিতরে-বাইরে ধাক্কা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। আর দুর্বল ভারত সরকার টুকরো টুকরো করে কাটা বি এস এফ জওয়ানদের লাশগুলো ফেরৎ নেওয়াতেই স্বস্তিবোধ করে। এখনও বাংলাদেশে উলফার অনেক শিবির বহাল তবিয়তে চলছে।

আর উলফার কার্যকলাপকে আই এস আই এবং বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স বারবার বাহ্বা জানিয়েছে। উলফা ও বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের এই মাখামাখি প্রকাশ্যে আসে যখন উলফার এক শীর্ষ নেতা, অনুপ চেতিয়াকে বাংলাদেশ পুলিশ ঢাকায় ১৯৯৭ সালের ২১ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ, জাল বাংলাদেশী পাসপোর্ট ব্যবহার, অনধিকৃত স্যাটেলাইট ফোন রাখা এবং বেআইনীভাবে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড,ফিলিপাইনস্, স্পেন, নেপাল, ভূটান, বেলজিয়াম, সিঙ্গাপুর সহ আরও কয়েকটি দেশের কারেন্সি নোট রাখার। এখানে উল্লেখ্য, অনুপ চেতিয়ার সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অনেক বছর কেটে গেছে। সে ভারতের ওয়ান্টেড লিস্টে ছিল। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ তাকে তুলে দেয়নি। চেতিয়ার সঙ্গেই ধরা পড়েছিল বাবুল শর্মা এবং লক্ষ্মীপ্রসাদ।

বাংলাদেশে অবাধে সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালানোর পাশাপাশি বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রকল্পও চালাচ্ছে। ঢাকায় রয়েছে বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক ফার্ম। তার মধ্যে মিডিয়া কনসালটেন্সি এবং সফ্ট ড্রিংক্স, কোল্ড ড্রিংক্স-এর ব্যবসা। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বিভিন্ন কোল্ড ড্রিংক্সের পণ্যসম্ভার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাজার দখল করে নিয়েছে। সবই আসে অবৈধ পথে। তবে কোনটার মালিক উলফা তা বলা মুশকিল।

উলফা গঠনের দশ বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশে ঘাঁটি স্থাপিত হয়। সে সময় ১৩-১৪টি শিবির ছিল। পরে ক্রমশ বাংলাদেশ উলফার পক্ষে সেফ হেভেন-এ পরিণত হয়। বাংলাদেশ থেকেই যাবতীয় অপারেশন, আধুনিক অস্ত্র সংগ্রহ চলতে থাকে। তার পরে ভারতে (পড়ুন অসমে) ঢুকে অ্যাকশন করা, আবার বাংলাদেশের ডেরাতে ফিরে যাওয়া। উলফার প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী ছিল মূলত দুটি সংগঠন। দুটোই

(এরপর ১৩ পাতায়)

বিধবাদের গ্রাম কাশ্মীর উপত্যকার 'দর্দপুরা'

পশ্চিমবঙ্গের পর্যটকদের পছন্দের সুন্দরবনে সৌন্দর্যের সঙ্গেই রয়েছে বেশ কয়েকটি দ্বীপ। যেখানে কেবলমাত্র বিধবারাই বাস করেন। 'বিধবাদ্বীপ' নামকরণ হয়ে গেছে। পুরুষেরা পেটের দায়ে বনে গিয়ে বাঘের পেটে গিয়েছে। কিন্তু দর্দপুরার পুরুষেরা গেল কোথায়? সুন্দরবনের বাঘ সেখানে যায়নি, আর পুরুষেরাও কেউ বাঘের পেটে যায়নি। তাহলে?

দর্দপুরা গ্রামের পিতৃহীন বালক-বালিকা।

বাসুদেব পাল ঃ দর্দপুরা। গ্রামের নাম। অবস্থান কাশ্মীর উপত্যকার পাকিস্তান লাগোয়া কূপওয়ারা জেলার অরণ্যশোভিত পার্বত্য এলাকার এক মনোরম স্থানে। রাজধানী শ্রীনগর থেকে মাত্র ১৩০ কিলোমিটার দূরে।

গ্রামে এখন এক অদ্ভুত শ্মশানের শান্তি বিরাজ করছে। গ্রামের একজন মাত্র সাবালক পুরুষ জীবিত আছে। আর আছেন ২০০ জন বিধবা, ৪০০ জন পিতৃহীন শিশু-কিশোর বালক-বালিকাকে নিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গের পর্যটকদের পছন্দের সুন্দরবনে সৌন্দর্যের সঙ্গেই রয়েছে বেশ কয়েকটি দ্বীপ। সেখানে কেবলমাত্র বিধবারাই বাস করেন। 'বিধবাদ্বীপ' নামকরণ হয়ে গেছে। পুরুষেরা পেটের দায়ে বনে গিয়ে বাঘের পেটে গিয়েছে। কিন্তু দর্দপুরারার পুরুষেরা গেল কোথায়? সুন্দরবনের বাঘ সেখানে যায়নি, আর পুরুষেরাও কেউ বাঘের পেটে যায়নি। তাহলে?

প্রশ্নটা এখানেই। পাকিস্তান প্রেরিত সন্ত্রাসবাদের শিকার দর্দপুরার পুরুষেরা। 'স্বাধীন কাশ্মীরের অবাস্তব স্বপ্নের নেশায় বুঁদ হয়ে সবাই যোগ দিয়েছিল পাকিস্তান ভিত্তিক বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় আবার অনেকেই সন্ত্রাসবাদীদের জোরজবরদস্তিতে। পরের কাহিনীর বাস্তবতা ভয়ানক। কেউ মারা গিয়েছে নিরাপত্তা-বাহিনীর গুলিতে, আবার অনেকে মারা পড়েছে জেহাদিদের বুলেটে। তার ফলে মেয়েরা হয়েছে বিধবা আর শিশুরা হয়েছে পিতৃহীন। এখন সকলের চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকার। আর এজন্য দায়ী সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানী নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন জেহাদি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। দর্দপুরার দর্দ-ভরা চিত্রনাট্য নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন মুম্বাই-এর তথ্যচিত্র নির্মাতা অশোক পণ্ডিত।

তাঁর বক্তব্য, এর আগে কাশ্মীরী হিন্দু পণ্ডিতদের দুর্দশা ও দুরবস্থা নিয়ে কাহিনীচিত্র 'শীন' (Sheen) তৈরি হয়েছে। কিন্তু উপত্যকার সন্ত্রাস যে উপত্যকাবাসী মুসলমানদেরও রেহাই দেয়নি তা সেভাবে ওঠে আসেনি। সেজন্য অশোক দর্দপুরাতে থেকেছেন, কাছ থেকে দেখে কথাবার্তা বলে গ্রামবাসী বিধবা ও পিতৃহীনদের পরিণতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন। তথ্যচিত্রের শিরোনাম দিয়েছেন—'এ ভিলেজ অফ্ উইডোজ্।'

বছর চারেক আগে খবরের কাগজে দর্দপুরার সম্পর্কে পড়েই বিশ্ববাসীর কাছে গ্রামের কাহিনী তুলে ধরার সংকল্প করেছিলেন অশোক পণ্ডিত। হাতের তালুর মতোই কাশ্মীরকে চেনা অশোক সেদিন অবাক হয়েছিলেন। সন্ত্রাসবাদের ফলে উদ্ভুত এই চিত্রটা তাঁর কাছে পরিচিতি ছিল না। কুড়িবছর আগের সন্ত্রাস-পূর্ব সময়ে দর্দপুরার গরীব মুসলমানরা কৃষিকাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করত। তখনও জীবনযাপন সহজ ছিল না, তাই বলে এখনকার মতো নির্দয়, নির্মম, অমানবিকও ছিল না। নিদেনপক্ষে শান্তি বিরাজ করত। সেখানে হঠাৎ করে সাইক্লোনের মতো আছড়ে পড়ল কাশ্মীরের আজাদীর নামে জেহাদি পাকপন্থী আলবদর, হিজবুল মুজাহিদিনের মতো কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদীরা। আর এই সন্ত্রাসবাদের সাঁড়াশি দর্দপুরাকে জাপটে ধরল আল্লার মহান কর্তব্য পালনের নামে। পুরুষ্ট চেহারার দাঁড়িওয়ালা মোল্লারা এসে গ্রামবাসীদের উপর কর্তৃত্ব করে। তাদেরকে ভর্তি করে নেয় জেহাদি শিবিরে। মোল্লারা এই কাজকে আল্লার নির্দেশ বলেই দাবী করে। গ্রামের যুবকরা সীমানা পার করে সোজা চলে যায় পাকিস্তানের জেহাদি প্রশিক্ষণ শিবিরে। গোপনপথে আবার কাশ্মীরে প্রবেশ করে। তখন অনেকবার ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে এনকাউন্টার হয়। তাতে কেউ কেউ মারা যায়।

ওইসব সীমান্ত এলাকায় প্রহরারত নিরাপত্তারক্ষীরাও সতর্ক থাকে, তাদেরও পাক-অস্ত্রে সজ্জিত সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে অন্য কোনও পথ থাকে না। অশোক পণ্ডিত তথ্যচিত্রে একইসঙ্গে গ্রামবাসীদের মুখেই তাদের দুর্দশার করুণ কাহিনীও শুনিয়েছেন।

এরকমই একজন হতভাগ্য মহিলা মমতা লোন। সে তার কাঠের ঘরের বাইরে বসেছিল। সে জানিয়েছে—সেনাবাহিনী তার স্বামীকে মেরে ফেলেছে। কারণ তার স্বামী পাকিস্তান ভিত্তিক জেহাদি সংগঠন হিজবুল মুজাহিদিনের শাখা 'আলবদর' বাহিনীর জঙ্গি ছিল। মমতার আরও বক্তব্য—'গ্রামের অধিবাসীদের প্রাণে বেঁচে থাকার জন্য জেহাদি-জঙ্গি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অন্যথায় পাক-মদতপুষ্ট অথবা পাকিস্তানী জঙ্গিরাই তাদেরকে হত্যা করতে কার্পণ্য ক'রত না।' এরকমই আরও এক মহিলা গুলজার বেগম। সে তার স্বামীকে শেষবার দেখেছে এক যুগ আগে। এখন আল্লাই তার একমাত্র ভরসা। আকাশের দিকে মুখ তুলে সে জবাব দিয়েছিল।

শৈশবেই মহম্মদ ইকবালের বাবা মহিউদ্দিনকে ছিনিয়ে নিয়েছে জেহাদিদের হানা বুলেট। মহিউদ্দিন নিয়মিত পাকিস্তান যাতায়াত করত। একদিন সীমান্তে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। ওখানেই ইকবালের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। এখন সে কাজ খুঁজছে টাকা রোজগারের জন্য। তার সংসারজীবনের যুদ্ধে পরাজিত বিধবস্ত তার মা ফতিমা বাঈও কেবল আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

একমাত্র উপার্জনকারীর মৃত্যুতে এই অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলাদের ভিক্ষে করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তথ্যচিত্র নির্মাতা অশোক কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তির সাহায্যে গ্রামবাসীদের বিশ্বাস অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার বক্তব্য এই করুণ অবস্থা যেকোনও বিবেকবান মানুষের অন্তরকে নাড়া দিতে পারে। দৈনন্দিন জীবনযাপনের অবস্থাটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মায়েরা একরকম বাধ্য হয়েই বাড়ির মেয়েদের কাজ করতে বাইরে পাঠাচ্ছেন। এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে। ওই মেয়েদের বাড়ীর কাজে নিযুক্ত করলেও দৈহিক শোষণও বাদ যাচ্ছে না।

কাশ্মীরে ক্ষমতার রাজনীতিতে আবদুল্লারা পিতাপুত্র এবং কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ভারসাম্যহীন চূড়ান্ত একপেশে রাজনীতিই এই দুরবস্থার জন্য দায়ী বলে অশোক পাণ্ডে মনে করেন। সেজন্য তিনি ওই তথ্যচিত্র রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশন এবং আমেনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যালকেও জানাবেন। সবাই জানুক কী চলছে। গ্রামে কোনও স্কুলই নেই। একটি অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র আছে যা আদতে নিষ্ক্রিয়। ফলে ক্ষুধা আর অশিক্ষা নিয়েই ছেলেরা বড় হয়। ফলে সহজেই জেহাদিদের জালে পড়ে ক্রুদ্ধ ও নিরুপায় যুবকেরা। জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের কাছে তারা মুখরোচক খাদ্য বিশেষ। অশোক পণ্ডিতের বক্তব্য পরিষ্কার। সন্ত্রাসবাদীরা (পড়ুন মুসলিম) আগে কাশ্মীর থেকে হিন্দু পণ্ডিতদের উৎখাত করেছে। এখন আবার সেই জঙ্গি মুসলমানদের দুরবস্থা নিয়ে সোচ্চার। এ কেমন রাজনীতি? অশোকের বক্তব্য—হ্যাঁ, আমি কাশ্মীরী পণ্ডিতদের জন্য লড়াই করেছি। একথা সত্য। তবে নিপীড়িতদের আবার ধর্ম কি? যখন সারা দেশ দর্দপুরার বিধবাদের ব্যাপারে নীরব, তখন আমি মুখ খুলতে চাই।' সবাইকে কটু সত্যটা জানাতে আগ্রহী অশোক।

এখন প্রশ্ন, আজ যখন কাশ্মীর উপত্যকা প্রায় হিন্দুশূন্য তখনও কি সেখানকার পবিত্র (পাক) স্থানে সুখ-শান্তি বিরাজ করছে? পাকিস্তান ও পাকমদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা কিসের দূত—সন্ত্রাসের, বুভুক্ষার না অন্য কিছুর?

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে নরেন্দ্র মোদীর দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা।। ১৯৬০ সালের ১লা মে। সুবিশাল বোম্বাই রাজ্য ভেঙ্গে নবজন্ম হলো দুটি রাজ্যের। একটির নাম মহারাষ্ট্র, অপরটি গুজরাত। এই গুজরাত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম সর্বজনবিদিত। তিনি নরেন্দ্র মোদী। তাঁর হাতে পড়ে গত এক দশকে প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে গুজরাতের। বলা বাহুল্য, জীবনের পঞ্চাশটা বছর পূর্ণ হতে চলা গুজরাত অপেক্ষা করে রয়েছে আরও বেশি উন্নয়নের। এই মুহূর্তে গুজরাত সরকারের স্লোগান—'উন্নততর গুজরাত, সমৃদ্ধ গুজরাত, শিক্ষিত গুজরাত, সমর্থ গুজরাত, পরিষ্কার ও সবুজ গুজরাত, সর্বোপরি আধুনিক গুজরাত।' তবে শুধুমাত্র স্লোগানেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে না গুজরাত সরকার, 'সোনার গুজরাত' গড়তে ইতিমধ্যেই কাজে নেমে পড়েছে তারা। গুজরাতের এই উন্নয়নে সমাজের সর্বস্তরের প্রতিটি গুজরাতিকে জুড়তে পরিকল্পনা নিচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং।

গুজরাত রাজ্যের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন যাতে সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় সেইজন্যে রাজ্যের উচ্চপদস্থ আমলা ও মন্ত্রীদের নিয়ে একটি উদ্‌যাপন সমিতিও তৈরি হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। আর এই সমিতির প্রধান পরামর্শদাতা হলেন নরেন্দ্র মোদী। আপাতত এই উদযাপনী বাজেটের পরিমাণ পঞ্চাশ কোটি টাকা। আগামী বছরের ১লা মে সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়ামে হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বর্ষব্যাপী গুজরাত রাজ্যের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পালন করার পরে ২০১১-এ গান্ধীনগরে সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে। তবে ওই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের প্রারম্ভেই ২০১০-এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বেরোবে ২২৫টি রথ। যার পোশাকী নাম দেওয়া হয়েছে স্বর্ণিম জয়ন্তী সংকল্প রথ। এই রথগুলোর কাজ রাজ্যের প্রত্যেকটি ব্লক, প্রত্যেকটি গ্রামে যাওয়া। সেখানকার মানুষের অভাব-অভিযোগ এবং সুবিধা-অসুবিধাগুলো সরাসরি গুজরাত সরকারের দরবারে পৌঁছে দিতেই নরেন্দ্র মোদীর এই অভিনব উদ্যোগ। এর সাথে সাথেই বেরিয়ে পড়েছে সংকল্প জ্যোতি রথ। যেটা শুধুমাত্র বিগত অর্ধশতাব্দী ব্যাপী গুজরাত সরকারের কৃতিত্বকেই তুলে ধরবে না উপরন্তু প্রত্যেকটি গুজরাতবাসীকে উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডে যুক্ত করবার প্রয়াসও চালাবে। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট এক আধিকারিকের কথায়—"সোনার গুজরাত সংকল্প জ্যোতি রথ কেবল উদ্বুদ্ধ করার একটি দার্শনিক এবং

উদ্দেশ্যমুখী যন্ত্র নয়, বরঞ্চ বলা ভাল এটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও স্বপ্ন দেখার অভিযান"। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও এই রথের প্রচারের সময় আবেদন করা হয়েছে যে রাজ্যবাসী যেন তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েই এই রথযাত্রাকে সফল করে তোলেন।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই এই রথ ১৬১টি নগর ও শহর প্রদক্ষিণ করেছে। এখনও পর্যন্ত এতে ৪৬ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮৫২ জন অংশগ্রহণ করেছেন। এর বাইরেও গুজরাত সরকারের হিসেবে আরও ৩২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮০৯ জন এ নিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংকল্প গ্রহণ করেছেন।

গুজরাতের উন্নয়নে ছাত্র-ছাত্রীদের শরিক করতে মোদীর টোটকা বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ৯,১৩৩টি স্কুলের ও কলেজের প্রায় হাজার ত্রিশেক প্রতিযোগী তাঁদের নাম জমা দিয়েছেন। রচনা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাচ্ছে গুজরাতের ঐতিহ্য, পরম্পরা, সংস্কৃতির বিষয়গুলো। আর বিতর্ক প্রতিযোগিতায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে রাজ্যের উন্নয়নে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বা দেশের বাইরে বসবাসকারী ভারতবর্ষের মানুষদের অবদানের মতো বিষয়গুলি।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপারটা হচ্ছে আধুনিক ভিডিও কমিউনিকেশন প্রযুক্তির সুযোগ নিয়ে নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মজয়ন্তীতে সারা রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখোমুখি হতে চাইছেন। এর জন্য এখনও পর্যন্ত ৪৩ হাজার ৪৫১টি স্কুল-কলেজ এবং ১১ হাজার ১৩৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯৩ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন জমা পড়েছে।

এতসব উদ্যোগ আয়োজনের মধ্যেও গুজরাত ভুলছে না তার কৃতী ভূমিপুত্রদের। সেই কারণে মাহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, ডঃ বিক্রম সারাভাই, মেসার্স ত্রিভুবন দাস, দাদাভাই নৌরজি, ধীরুভাই আম্বানী, কবি নর্মাদ, সরলা তাই, ঠক্কর বাপা-র জন্মজয়ন্তীগুলো পালনে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী সরকার।

তবে এতসব আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যেও শিল্পোন্নয়ন-ই যে তাঁর তালিকায় সর্বাগ্রে থাকছে তা বোঝানোর কোনও ত্রুটি রাখছেন না নরেন্দ্র মোদী। আগামী ১২-১৩ জানুয়ারী বিশ্বের তাবড় তাবড় শিল্পপতিরা রাজ্যের ৮৫০০টি প্রকল্পে ২৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (১২ লক্ষ কোটি) বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করবেন আমেদাবাদে একটি অনুষ্ঠানে। অন্যদিকে আগামী এক বছরের মধ্যে গুজরাতের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিতে মোদীর ভরসা এই দুটি প্রকল্প—শিক্ষা-অভিযান ও নারীশিক্ষা অভিযান। সেই সাথে উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের আই আই এম, এন আই ডি, নিফট, সেপ্ট, আই আই টি, ফরেন্সিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং পেট্রোলিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্বমানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

একল বিদ্যালয়

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের উত্তরসূরী

অর্ণব নাগ

থমাস ব্যারিংটন মেকলে নামে এক বৃটিশ পণ্ডিত যখন ভারততীর্থে পদার্পণ করেন তখন বণিকের মানদণ্ড সরকারিভাবে না হলেও কার্যত রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছে। বিলেতের মহারাণীর রাজত্ব এদেশে প্রতিষ্ঠা পেতে তখনও প্রায় সিকি শতাব্দী দেরি রয়েছে। একইসঙ্গে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বণিকদিগের শাসনের যন্ত্রণাও ভোগ করতেই হচ্ছে ভারতবাসীকে। যার দায়ভার ভারতবর্ষের সমাজও এড়াতে পারে না। সুদূর প্রবাসে রাজা রামমোহন রায় জীবনের প্রান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছেন তখন। বৃটিশ আগমনের পূর্বে ফরাসীরা কিছুদিন এদেশে কাটালেও 'রেঁনেসা' শব্দটার সঙ্গে আপামর দেশবাসীর সেইসময় তেমন পরিচয় নেই। কিন্তু রেঁনেসা বা নবজাগরণের একটা পটভূমি যে তৈরি হচ্ছে তা চোখ এড়াল না মেকলে সাহেবের।

এই মেকলে সাহেবই পরবর্তীকালে লর্ড উপাধি পাবেন। নবজাগরণের মুখ্য কারিগর কামারপুকুরের গদাধর ঠাকুর (উত্তরকালের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেব) তখনও জন্মাননি। সুতরাং তাঁকে ঘিরে মধ্যবিত্ত সমাজের আনাগোনা হতে এরপরেও বেশ খানিকটা সময় লাগবে। কিন্তু এই মেকলে যেটাকে রেঁনেসা বলে ভাবছেন সেটাকে মোটেও নবজাগরণ বলা যাবে না। বড়জোর প্রাক-নবজাগরণ পর্ব গোছের কিছু একটা বলা যেতে পারে।

যাই হোক, রামমোহন ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসুক হয়েছেন প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ব্রাহ্মআন্দোলনের ধারা হিন্দুকে শুদ্ধ করণের কাজে কতটা লাগছে তা বোঝা গেল না বটে তবে এর বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দুদের দাপট নতুন করে একটা বিপত্তির সৃষ্টি করল। তৈরি হলো ডিরোজিও-র আখড়া। এই আখড়া-টির মূল কেন্দ্র তৎকালীন হিন্দু কলেজ, অধুনা প্রেসিডেন্সী কলেজ। এদের বিরুদ্ধে একা লড়ছেন বীরসিংহের বীরপুঙ্গব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। হাতিয়ার সংস্কৃত কলেজ।

নেটিভদের এই লড়াই দেখে ভারী মজা পেলেন মেকলে। 'মিনিট অন ইন্ডিয়ান এডুকেশান' রচনা করার প্রয়াস রীতিমতো আহ্লাদিত করে তুলল তাঁকে। আর এর পেছনে ছিল বাঙালীরও নিতান্ত দুর্ভাগ্য। কারণ বঙ্গসাহিত্য জগতে সম্রাট রূপে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিশ্বকবি রূপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব হয়নি তখনও। অন্যদিকে ইংরেজি সাহিত্যে তখন শেক্সপীয়ারের মেলোডি কিংবা কীটস-বায়রন-শেলী বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যসুষমায় ভরা যৌবন। মেকলে বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে সরাসরি বুদ্ধি যোগালেন—নেটিভরা আর কিছু পারুক ছাই না পারুক, ভালোমতন মাছি মারা কেরানী অন্তত হতে পারবে। তাই তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য যাবতীয় যা কিছু আছে সব লাটে তুলে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কেরানী করে গড়ে তোল। শুধু সাহিত্যের ওপর দিয়ে এই মেকলিয়ান ঝড়টা গেলে যাও বা সহ্য করা যেত কিন্তু ঝাপটা-টা এল শিক্ষা ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই। ডিরোজিও আর তাঁর সহযোগীদের মাধ্যমে তৈরি হওয়া নিষ্পাপ সেই ঝড়ের তাণ্ডবলীলা বাড়াল বই কমাল না। ঝড়ের নিট ফল—হিন্দু কলেজ পর্যবসিত হলো প্রেসিডেন্সী কলেজে।

তবে সব অমঙ্গলেরই একটি মঙ্গলময় দিক থাকে। সেই কারণে ঝড়ের এত তাণ্ডবের পরেও বঙ্গভূমির প্রকৃত রেঁনেসা-র অনুপম দৃশ্যাবলী ক্রমশ দৃষ্টিগোচর হতে থাকল। দৃষ্টিটা একটু প্রসারিত করলে জয়রামবাটী ও কলকাতা দু' জায়গায় দু'জন সারদাদেবীকে দেখতে পাওয়া যাবে। দেশের নবজাগরণে এঁদের ভূমিকা অপরিসীম। প্রথমা সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পত্নী, যাঁর স্নেহচ্ছায়ায় চিরটা কাল নিশ্চিন্তে কাটিয়েছেন সিমলের নরেন দত্ত (উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ) ও তাঁর গুরুভাইরা। আর দ্বিতীয়া, মহর্ষি দেবেন ঠাকুরের পত্নী সারদাদেবী। এনারই অষ্টম গর্ভজাত সন্তানের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যিনি 'জাতীয় শিক্ষা' আন্দোলনে পুরোধা পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মআন্দোলনের ধারায় নতুন জোয়ার আনলেন কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বসু। আনন্দমোহন তৈরি করলেন সিটি কলেজ। একের পর এক বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগল সারা কলকাতা শহর জুড়ে। সেই সময় ঋষি বঙ্কিম আর বিবেক সন্ন্যাসীর দাপটে ডিরোজিও-র প্রভাব একেবারেই অস্তমিত। যদিও রবি ঠাকুরের গানে আর রচনায় আত্মসমর্পণ করা বাঙালী সেই সময়েও মেকলে শিক্ষাব্যবস্থার নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। যার ফলে তখন অন্তেবাসী শিক্ষা (গুরুগৃহে বাস করে শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি) বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতিতে পরিণত। তবে সুখের কথা, রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের ধারায় তখন তোলপাড় হচ্ছে ভারতবর্ষীয় সমাজ। ঠাকুরের কাছে কেশব সেনের আগমন এই বার্তাই দিচ্ছে—ব্রাহ্মধর্মের ধারা খুঁজে নিতে চাইছে তার হিন্দু মায়ের স্নেহাঙ্ক। সুতরাং হিন্দু জাগছে।

'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন' নামক কাসুন্দিটিকে যতই ঘাঁটা হোক না কেন তা পুরোনো হওয়া দূরঅস্ত। কারণ স্বদেশী আন্দোলনই বলুন কিংবা বন্দেমাতরম মন্ত্রের উষালগ্নই বলুন বা হিন্দুত্বের জাগরণই বলুন অথবা বিপ্লবীয়ানার রোম্যান্টিসিজমই বলুন—এই সবকটারই মাহেন্দ্রক্ষণ লর্ড-কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরোধিতায় দেশব্যাপী গড়ে ওঠা এক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। যার সময়কাল ১৯০৫-১৯১১। কেরানী বানানো পুঁথিগত শিক্ষার মেকলীয় পন্থা থেকে বেরিয়ে জাতীয় শিক্ষা'র দাবীতে সরব হওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণও যে ওটাই!

এই মাহেন্দ্রক্ষণের বেশ কয়েকজন পুরোধা পুরুষের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, এঁদের সর্বাগ্রে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাছাড়াও আছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ। মাহেন্দ্রক্ষণে নতুন আবেশ যোগ করলেন এক ইংরেজ—নাম উইলিয়াম হান্টার। তাঁর লেখনীতে—"ইংরেজি শিক্ষার আওতায় যারা গড়ে উঠছে, তাদের মনে না আছে নিয়মানুবর্তিতা, না আছে ধর্মভাব, না আছে তৃপ্তির স্বস্তি। এ শিক্ষার প্রভাবে যে কেরাণীর দল ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলেছে, সরকারের সকল চাকুরির দুয়ার তাদের সম্মুখে খুলে ধরলেও তাদের সন্তুষ্ট করা যাবে না।" জাতীয় শিক্ষার দাবীতে মনীষীদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। যেমন-গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'A Note of Dissent', ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের 'Note on University Reform' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ ('নিউ ইন্ডিয়া', ১৯০২) এবং সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি সুদীর্ঘ রচনা 'An Examination into the Present System of University Education and a Scheme of Reform'. সতীশ মুখুয্যে তাঁর লেখাটির বাস্তব প্রতিফলন ঘটালেন ১৯০২ সালের জুলাই মাসে 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষার ত্রুটিগুলো দূর করে ছাত্রদের ব্যবহারিক শিক্ষাদান, তাদের নৈতিক চরিত্র-গঠন ও অন্তরে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করাই ছিল এই সোসাইটির মূল লক্ষ্য। ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ-ও ছিলেন এই ডন সোসাইটিরই ছাত্র।

জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯০৬ সালের ১৪ই আগষ্ট ন্যাশানাল কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—"ছাত্রদের সত্যকার মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, তাদের মনে যথার্থ জ্ঞান-স্পৃহা সঞ্চার এবং জাতীয় চেতনার পূর্ণ বিকাশই এই 'জাতীয় শিক্ষার' লক্ষ্য এবং কারিগরি দিক দিয়ে দেখলে দেশের প্রাকৃতিক উৎস ও ধাতব-সম্পদ বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় শিক্ষাই দেওয়া হবে জাতীয় শিক্ষা'র মাধ্যমে।" তবে আমরা সরাসরি জাতীয় শিক্ষার আগার কথায় চলে এসেছি। গোড়ার কথায় যায় নি। ১৯০১ সালেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে'র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ সালের ১৫ই নভেম্বর 'ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনে' অনুষ্ঠিত দেশীয় নেতৃবর্গের প্রথম মন্ত্রণাসভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। ১৯০৬-এর ১১ই মার্চ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বা দ্য ন্যাশানাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন নামে একটি স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাব ঘটে। ওই বছরেরই ১৪ই আগষ্ট জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিচালনাধীনে জন্ম নেয় 'দ্য বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ অ্যান্ড স্কুল'।

তাই একথা অনস্বীকার্য যে বিশ শতকের গোড়ায় দেশপ্রেমের যে ফল্গুধারায় প্রবাহিত হয়েছিল 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন', সেই একই উদ্দেশ্য আজ সাধিত হচ্ছে গুরুমুখী একল বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে।

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে...

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

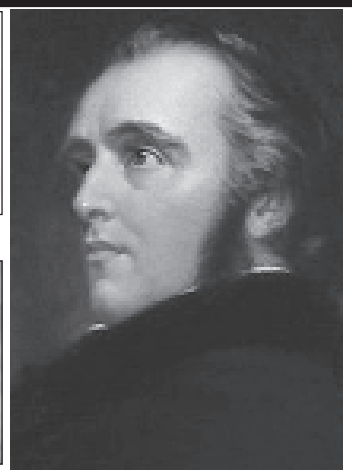
লর্ড মেকলে

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

কেশবচন্দ্র সেন

গুরুমুখী শিক্ষার পরম্পরার

সুপ্রাচীনকালে যে গুরুমুখী বিদ্যাশিক্ষার সূচনা হয়েছিল, বনবন্ধু পরিষদের এ
যে বিদ্যালয় আজ প্রকৃত আদর্শবাদী মানুষ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলে
বিদ্যালয়ের ভূমিকা আজ আর কেউই অস্বীকার করতে পারছেন না। গত কয়ে
বিদ্যালয়ের প্রধান কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রশ্ন ও আলাপচারিতার পর এই প্রতিবে

❑ একল বিদ্যালয় অভিযান কী?

● একল বিদ্যালয় বিস্তারের যে কর্মসূচী বনবন্ধু পরিষদ নিয়েছে তা-ই একল বিদ্যালয় অভিযান। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে তাহলে একল বিদ্যালয় কী? একজন শিক্ষকের মাধ্যমে সংস্কারযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি হল একল বিদ্যালয়। যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক কেবল একজন।

❑ এই অভিযানকে বিদ্যালয় শব্দ দ্বারা সূচিত করছেন কেন?

● বিদ্যালয়ের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যেই এই অভিযানের পথচলা। অন্যভাবে আমরা বিদ্যালয় বলতে যে ভাবনার সঙ্গে একাত্ম, এটার বাহ্যিক রূপ হয়তো তেমন নয়। কিন্তু বিদ্যালয় দ্বারা যে পরিণাম আমরা আশা করি এর দ্বারা সেই ফলাফল নিশ্চিতভাবে হচ্ছে। তাই এটাকে বিদ্যালয় বলতে কোনও আপত্তি তো থাকার কথা নয়।

❑ এর উদ্দেশ্য কি?

● প্রথম হলো আমাদের দেশে যে ন' কোটি জনজাতি রয়েছে তাদের ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম করা এবং প্রথাগত শিক্ষার আলোকে নিয়ে আসা। এই সঙ্গে দেশের দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী পিছিয়ে পড়া ভাই-বোনেদেরও সংস্কারিত তথা শিক্ষিত করে তোলা।

❑ শিক্ষা এবং সংস্কার বলতে আপনারা কি বোঝাতে চান?

● এর অর্থ আমরা অর্থাৎ বনবন্ধু পরিষদ তথা একল বিদ্যালয় অভিযান পরিচালকেরা

বর্তমান সভ্যতার সংকট ও একল বিদ্যালয় অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সময়টা ছিল বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ। বৃটেনের একদল বিজ্ঞানী এক অদ্ভুত ধরনের গবেষণা শুরু করেছিলেন। বেশ কিছু মানুষকে তারা কয়েক বছর ধরে কংক্রিটে ঘেরা এক কৃত্রিম শহরের মধ্যে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়েছিলেন। কোনও ভাবেই তাদের সবুজ গাছ-গাছরার সঙ্গে সংযোগ হতে দিতেন না। বাকি সমস্ত কিছু অর্থাৎ বসবাস, খাদ্য-পানীয় বেশ উৎকৃষ্ট মানের ছিল। এইভাবে বেশ কিছু বছর চলার পর এক সময় দেখা গেল ওই মানুষগুলোর মানবিক গুণগুলি অনেকটাই হারিয়ে গেছে। সূক্ষ্মভাবে তারা চিন্তা করতে অক্ষম হয়েছে। মনোনিবেশ ক্ষমতা অনেকটা হারিয়েছে। সর্বোপরি মানসিক ভারসাম্যও অনেকটা হারিয়ে গেছে। তাদের মানসিকতার মধ্যে অস্বাভাবিক হারে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছুদিন পর যখন তাদের আবার গাছ-গাছালি ঘেরা সবুজের মধ্যে রাখা হলো তখন দেখা গেল আগের মতোই তারা স্বাভাবিক হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকগণ এঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শারীরিক, মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হলে মানুষ যত বেশি সম্ভব প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থাকবে তত বেশি ভাল থাকবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ শুধু শরীরকেই সুস্থ রাখেনা পরোক্ষে মন-মানসিকতার উপরও ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

একই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন জার্মানির দার্শনিক ডঃ সুমেকার। তিনি গ্রাম ও শহর জীবন নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে যখন পাঁচ লাখ বা দশ লাখ লোক ঘনবসতিপূর্ণ ভাবে বসবাস করে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম বোধশক্তি লুপ্ত হতে থাকে। সেখানকার মানুষ অনেক বেশি বেশি প্রবৃত্তি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। যার থেকে শুধু মানসিক উষ্ণতাই বৃদ্ধি পায় না, অনেক বেশি ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়। নীতি-নৈতিকতা ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে যায়।

সম্প্রতি মার্কিন দার্শনিক স্যামুয়েল হ্যান্টিংটন এবং তার যোগ্য ছাত্র ডঃ ফ্রান্সিস ফটুয়ামা সভ্যতার সংকট নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে শহর ভিত্তিক সভ্যতাগুলিতে অস্তিত্বের সংকট প্রবল। একদিকে তো প্রকৃতি সংহার করে তারা বা তাদের দেশ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে। অন্যদিকে কয়েক প্রজন্ম শহরাঞ্চলে থাকতে থাকতে তারা অগ্রগতির নামে যে অবস্থায় পৌঁছেছে তাতে ন্যায়-নীতি পাপ-পুণ্য ইত্যাদির ধ্যান-ধারণাগুলো ফিকে হয়ে গেছে। আর এখান থেকেই তৈরি হয়েছে যাবতীয় ভুলবোঝাবুঝি, হানাহানি, অসুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা, হিংসা-দ্বেষ। এসবের মধ্যেই অকারণে জর্জরিত থাকতে হচ্ছে তাদের। এসবের অনিবার্য পরিণাম হিসেবে নিম্নমানের মানুষে সমাজ ভরে যাচ্ছে। যা আজ পশ্চিমী সভ্যতার সাংস্কৃতিক চিত্র চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে।

একই বিষয় নিয়ে জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি জাপানের মতো দেশের সমাজ-তত্ত্ববিদ তথা চিন্তাবিদরা রীতিমতো চিন্তিত। একদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অন্যদিকে মানবিকগুণের ক্রম অবলুপ্তি। যা তীব্রভাবে তাদের দেশ তথা সন্তানকে ক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এসবের থেকে পরিত্রাণের জন্যই আজ দরকার সবুজ গাছ-গাছরার ব্যাপক প্রসার, নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা, ত্যাগ, সংযমের অনুশীলন। এখনই এ বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন পশ্চিমী বিশ্বের তাবড় তাবড় গবেষক চিন্তাবিদরা।

উল্টোদিকে আমরা যখন আমাদের সংস্কৃতির দিকে নজর দিই তখন দেখতে পাই আমাদের ঋষি-মুনিরা শিক্ষার উর্বর ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিতেন গাছ-গাছালি অধ্যুষিত প্রকৃতির সবুজ কোলকে। শুধু তাই নয়, ন্যায়-নৈতিকতা স্বাবলম্বন ইত্যাদিকেও শুধু পাঠ্যসূচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তা আচার আচরণের মধ্যে দিয়ে অনুশীলন ও অনুধাবন করিয়ে বোধ ও বুদ্ধির মধ্যে প্রয়োগ করতেন। তাই আজ দেখা যাচ্ছে গত কয়েক শতাব্দী ধরে ঝড় তোলা সভ্যতাগুলো আজ আর উৎকৃষ্ট মানুষ তৈরি করতে অক্ষম। তাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তা-ভাবনা তথা গবেষণালব্ধ তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা বহন করতেই তারা অক্ষম।

বৃটেনের বিজ্ঞানী তথা গবেষকগণ সেদিন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, জার্মানির সুবিখ্যাত দার্শনিক ডঃ সুমেকার তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে যে মন্তব্য করেছিলেন, মার্কিন দার্শনিক স্যামুয়েল হ্যান্টিংটন সভ্যতার এই সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য তথা মানবিক গুণের সংরক্ষণ-সংবর্দ্ধনের জন্য যে তত্ত্ব তুলে ধরতে চেয়েছেন তা কিন্তু আমাদের শত-সহস্র মুনি-ঋষির লক্ষ লক্ষ বছরের ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। এক কথায় এসবেরই ফলিত প্রয়োগ হল একল বিদ্যালয় অভিযান।

বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি দুর্গম অঞ্চলে বিশেষত দেশ জুড়ে প্রায় সাড়ে ন কোটি জনজাতি এবং পিছিয়ে পড়া ভাই-

একল বিদ্যালয়

বোনদের একজন শিক্ষকের মাধ্যমে সুসংস্কার আধারিত যে শিক্ষা দেওয়ার প্রক্রিয়া বনবন্ধু পরিষদের মাধ্যমে চলে আসছে তা-ই হলো একল বিদ্যালয় অভিযান। গত প্রায় দু-দশক ধরে বনবন্ধু পরিষদ দেশজুড়ে বহুমুখী কর্মকাণ্ড বিস্তার করে চলেছে। একল বিদ্যালয় অভিযান হলো সেই বিস্তৃত কর্মকাণ্ডেরই অবিচ্ছেদ্য যোজনা। তীব্র জাতীয়তাবোধ তথা আদর্শ বোধে উদ্বুদ্ধ যুবকরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবার পর এই কাজের জন্য উৎসর্গীকৃত হন। এক-একজন এই ধরণের যুবক শিক্ষক হিসাবে নিজেদের আচরণের মাধ্যমে শিশু, বালক-বালিকাদের শিক্ষা প্রদান করেন। যে শিক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাসহ উচ্চশিক্ষা লাভের ভিত্তি তৈরি হয়, তাই-ই অদূর ভবিষ্যতে পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হয়ে উঠে। এই বৃহৎ ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার যে রূপরেখা তা মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি সংস্কার ও শিক্ষা মূলক।

সংস্কার ও শিক্ষামূলক বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

প্রাথমিক শিক্ষা—এই পর্যায়ে অক্ষরজ্ঞান, সংখ্যা গণনা ইত্যাদির সঙ্গে গল্প, ছড়া, নীতিকথা, দেশাত্মবোধক গীত ইত্যাদির চর্চা।

স্বাস্থ্য সচেতনতা ও শরীর শিক্ষা—নিজের শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। পোষাক পরিষ্কার রাখা, নিয়মিত ব্যায়াম আসন ইত্যাদির অভ্যাস করানো হয়। এসবের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বালক শিশুরা নিজেরাই পরিষ্কার থাকতে পারে এবং শরীর সুস্থ রাখার জন্য শরীরচর্চার মানসিকতা গড়ে উঠে।

শ্রদ্ধা-সম্মান--পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা, পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকা এবং তাদেরও সম্মান জানানোর শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্বচ্ছতার শিক্ষা—নিজেদের ঘর, উঠোন, বিদ্যালয় গ্রামের মুখ্য স্থানগুলিকে পরিষ্কার করানোর অভ্যাস সপ্তাহে একদিন করে করানো হয়। যাতে নিজেদের ঘর সহ গ্রাম বসবাসের সু-উপযোগী হয়।

আরোগ্য শিক্ষা—সাধারণ অসুস্থতার প্রাকৃতিক নিয়মে কিভাবে আরোগ্য লাভ করা যায় তার শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়া কেটে বা ছিঁড়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ সহ ব্যবহারিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্বাবলম্বন—নিজের কাজ নিজে করার মধ্যে যে স্বাভিমান ও আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে তার যথাযথ ব্যবস্থা রাখা হয়। এছাড়াও হাতের কাজ এবং রুচি অনুসারে একটু বড়দের শিল্পকর্মের প্রশিক্ষণ এবং প্রেরণা দেওয়া হয়। যাতে বড় হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক সূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দৈনিক শিক্ষার পাশাপাশি অভ্যাস অনুশীলন করান। ফলে ৩৮ বছরের মধ্যেই এই বিদ্যালয়ে আসা জনবসতি বা পিছিয়ে পড়া ভাই-বোনেরা প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি মানবিকগুণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। ভবিষ্যত জীবনে তারা কর্মঠ, উদ্যোক্তা হয়ে উঠে। এর চাইতেও বড় কথা তারা নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে স্বাভিমানী হয়ে উঠে। ন্যায়-নৈতিকতা বোধ বিবেক বোধ জাগ্রত হয় যার পরিণামে পরবর্তী জীবনে নিজেরাই নিজেদের পরিচালনা করতে সক্ষম হয় যা কখনই সমাজ বা রাষ্ট্রজীবনের স্বার্থের সঙঘাতে উপনীত হবে না। এই রকম একটি দূরদর্শী সমৃদ্ধ তত্ত্বে ভরপুর হলো একল বিদ্যালয় অভিযান।

সাংগঠনিক দিকগুলির লক্ষ্য হলো এক সংস্কার-প্রদানকারী কর্মকাণ্ডকে সুষ্ঠুভাবে সঞ্চালন করা এবং একইভাবে দেশের সর্বত্র বিস্তার করা। এর উদ্দেশ্যেই প্রতিটি গ্রামে যেমন একজন শিক্ষক দ্বারা এক-একটি বিদ্যালয় চালানো হয় তেমনি শুভানুধ্যায়ী তথা হিতচিন্তকদের নিয়ে গ্রাম সমিতি গঠন করা হয়। যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষককে সহায়তা করেন এবং ওই বিদ্যালয়ের যাবতীয় সুবিধা-অসুবিধার প্রতি নজর রেখে সুস্থ সঞ্চালনে সহায়তা করেন।

কয়েকটি গ্রাম সমিতিগুলি নিয়ে তৈরি করা হয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি। এই সমিতিতেও শুভানুধ্যায়ী তথা হিতচিন্তকদের রাখা হয়। যারা গ্রাম সমিতিগুলির যাবতীয় সহায়তার পাশাপাশি পঞ্চায়েতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে কিভাবে ওই বিদ্যালয় বিস্তার করা হবে। কাকে উপযুক্ত শিক্ষা হিসাবে পাঠানো হবে ইত্যাদি কাজের তদারকি করেন তারা। একই পদ্ধতিতে ব্লক, জেলা সমিতি তৈরি করা হয়। শহরাঞ্চলের নগর সমিতি করা হয়, যারা এই কর্মকাণ্ডের সঞ্চালনের সহায়ক হিসাবে কাজ করেন। এই কর্মকাণ্ডের হিসাব রাখা, আর্থিক দিক নিয়ে চিন্তা ভাবনা, প্রশাসনিক ও আইনি দিকগুলি দেখা, বড় ধরণের কার্যক্রমের ব্যবস্থা দেখা ইত্যাদি দিকগুলির বেশীরভাগই নগর সমিতি দেখে থাকে। এই ভাবে প্রান্ত ও সর্বভারতীয় সমিতি করে এই বিশাল কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটিয়ে চলেছে বনবন্ধু পরিষদ।

ম্পরার ধারক একল বিদ্যালয়

বনবন্ধু পরিষদের প্রচেষ্টায় সেই পরম্পরার পরিবর্তিত রূপ একল বিদ্যালয়। নিয়ে কাজ করে চলেছে। সারাদেশে বনবাসী ছাত্রছাত্রীদের উন্নতির পিছনে এই রছেন না। গত কয়েকবছর ধরে একল বিদ্যালয় নিয়ে বনবন্ধু পরিষদ ও একল তার পর এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন ভোলানাথ ভাদুড়ি।

আলাদা করে কিছু বুঝতে বা বোঝাতে চাই না। এ ব্যাপারে আমাদের যে পরম্পরাগত ভাবনা রয়েছে আমরা তারই ধারক বা বাহক। এই দিক থেকে বলতে পারি—অক্ষর জ্ঞান, সংখ্যা গণনা ইত্যাদি অত্যন্ত সাধারণ বিষয় থেকে জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় দিকগুলিকে জানানো, অবগত করানো এবং সেই সঙ্গে সুস্থ চিন্তা-ভাবনা, উপলব্ধিরত ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দৈনন্দিন পাঠ্যসূচীর মধ্য দিয়ে আমাদের ভাই-বোনদের যে চর্চা বা অনুশীলন করানোর প্রক্রিয়া চলে তাকে আমরা শিক্ষা বলে মনে করি।

এই সকল উপলব্ধি যখন আচরণের মধ্য দিয়ে বাস্তবে ফুটিয়ে তোলা হয় এবং শারীরিক ও মানসিক ক্ষেত্রেও সুষ্ঠু বিকশের লক্ষ্য করি তখন সেই পর্যায়কে আমরা সংস্কার বলি।

❑ একল বিদ্যালয় অভিযানে শিক্ষা ও সংস্কার বলতে যে ধারণার কথা বললেন তার বাস্তবোচিত প্রয়োগ হচ্ছে?

● বাস্তবোচিত কেন প্রকৃত প্রয়োগই হচ্ছে। আমাদের শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু এবং তার অনুশীলন তথা প্রয়োগ বিধি ঠিকভাবে দেখলে বুঝতে পারবেন কিভাবে বাস্তবে এর প্রয়োগ ঘটছে। একল বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ গঠনতন্ত্র তো ওই আধারের উপরই দাঁড়িয়ে। দেশ জুড়ে চলা একল বিদ্যালয়ের যে কোনও স্থানে যে কোনও একটিতে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখবেন ছোট ছোট ভাই-বোনেরা কত সুন্দরভাবে সংস্কারিত হচ্ছে।

(এরপর ১৬ পাতায়)

হজে ভর্তুকি, সাগরে জিজিয়া কর

'একলক্ষ তেইশহাজার দুইশত এগারো (১,২৩,২১১ জন) জন হজযাত্রীকে কেন্দ্রীয় ভর্তুকি' সংক্রান্ত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রের অবতারণা।

প্রথম প্রশ্ন দেশের সংখ্যালঘু মুসলিমদের ধর্মীয় ব্যাপারে উচ্চে উন্নীত করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক উপায়ে নির্বাচনের স্বার্থে তোল্লা দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভর্তুকির প্রতিবাদ করা উচিৎ জনগণের। কারণ এই প্রকার ভর্তুকি দিয়ে এক বিশেষ সম্প্রদায়কেই লাভবান করা হচ্ছে কেন? যেখানে অন্যধর্মের অনুগামীদের এই ভরতুকি থেকে শুধু বঞ্চি ত করাই হয় না ঔরঙ্গজেবের আমলের ন্যায় নানা ক্ষেত্রে জিজিয়া কর নেওয়া হয়ে থাকে।

পৌষ মাসের শেষে এখানে গঙ্গাসাগরের যে মেলা বসে সেখানে যেতে সাধারণ সময়ে সরকারি লঞ্চ ভাড়া সাড়ে ছয় টাকা সেটা মেলার সময় মাথাপিছু চল্লিশ (৪০) টাকা নেওয়া হয়। আর কচুবেড়িয়া থেকে গঙ্গাসাগর বাসে যেটা সাধারণ সময়ে ১৩ টাকা সেটা মেলার সময় সরকারি রেট হয় ৪৫ টাকা। কলকাতার ধর্মতলা থেকে ৮ নং লট অবধি সরকারি বাসভাড়া ৩৮ টাকা মেলার সময় দিতে হয় ৮০ টাকা, শুধু তাই নয় লঞ্চে ওঠার আগেই পঞ্চ ায়েৎ থেকে পিলগ্রিমেজ ট্যাক্স হিসাবে ১০ টাকার রসিদ নিয়ে তবে লঞ্চে ওঠা যাবে। এটা গেল গঙ্গাসাগরের মেলার 'জিজিয়া' করের হিসাব।

এরপর আছে কুম্ভমেলায় যাওয়ার ব্যাপারে সরকারি নেওয়া করের ব্যাপারে। এটার ব্যাপারে সরকার কেন যে উদাসীন কে জানে? বসালেই পারে পিলগ্রিমেজ কর।

হিন্দুতীর্থ কৈলাশ-মানস সরোবর যেতে সরকার কোন প্রকার ভরতুকি তো দেয়ই না পরন্তু বর্তমানে মনে হয় ৭২ হাজার টাকা জমা দিয়ে সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে যাতায়াত করতে হয়। যদি সংখ্যালঘুদের মাত্র ১৬ হাজার টাকা জমা নিয়ে বিমানে জেড্ডা যাওয়া আসা সহ সকল খরচ বিপুল ভরতুকি দিয়ে করানো হয় তাহলে কৈলাশ-মানস সরোবর যাবার জন্য হিন্দু তীর্থযাত্রীদের দেওয়া হবেনা কেন? তারা কি কেন্দ্রীয় সরকারকে ভোট দেয় না? না, তাদের ভোট নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে না।

ভারতসরকারের ন্যায় এতটা উদার মনে হয় বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানও নয়। তাদের দেশের মুসলমানদের হজযাত্রার জন্য এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ভরতুকি দেওয়া হয় না। নিজ ব্যয়ে তাদের হজযাত্রা করতে হয়। আর দেবেই বা কেন? কিছু ব্যক্তিকে মৌলবাদী করানোতে রাষ্ট্রের কি উপকার কে জানে! তাই মনে হয় বাংলাদেশ ও পাকিস্তান তোল্লা দেওয়া ভারত সরকারের ন্যায় এতটা উদার নয়। হজে যেতে হলে-'ফেল কড়ি মাখো তেল'-পদ্ধ তি ওদেশে অনুসৃত।

যে দেশে টাকার অভাবের জন্য বিভিন্ন অফিসে কর্মী নিয়োগ বন্ধু, নতুন কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছেনা ভিত্তিপ্রস্তরেই সীমাবদ্ধ থাকছে, সেখানে সরকার কোষাগার থেকে বিশেষ এক সম্প্রদায়কে এই ভর্তুকি দেওয়ার পিছনে কি গোপন ব্যবস্থা আছে কে জানে? এ পোড়া দেশে সবই সম্ভব। এসব দেখে মনে হয় আমরা বোধহয় আরব দুনিয়ার কোনও দেশে বাস করছি!

দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান

সেতু সংস্কারের দাবী

রাজগ্রাম-বাঁকুড়া সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ সেতু ১৯৪৭ সালে তৎকালীন বাঁকুড়াবাসী জনৈক ধনী ব্যবসায়ী নিজ খরচে তৈরি করে দিয়েছিলেন। এখন তা জরাজীর্ণ, ১৪০ ফুট লম্বা, ১৮ ফুট চওড়া, আড়াই ফুট রেলিং, চারটি স্তম্ভ দিয়ে সেতুর দু'দিকে গার্ড দেওয়া আছে। নিচের দিকে তাকালেই জীর্ণদর্শা চোখে পড়ে। রড-সিমেন্টের ঢালাই ফেটে-ফুটে চৌচির হয়ে গেছে। সেতুটি পুনর্নির্মাণের জন্য বার বার পূর্তবিভাগ এবং বাঁকুড়া পুরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কোনও কাজ হয় নাই। সেজন্য আপনার পত্রিকার মাধ্যমে রাজ্যের পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

মদনমোহন দত্ত, রাজগ্রাম, বাঁকুড়া

মাওবাদীদের নিয়ে রাজনীতি

জমে উঠেছে 'দাদা-দিদি'-র রাজনৈতিক তরজা। একদিকে বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য এবং অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তরজার বিষয় ঃ পশ্চি মবঙ্গের মাওবাদী সমস্যা।

এ রাজ্যের প্রায় সবাই-ই অবগত আছেন যে মাওবাদীরা এরাজ্যে যথেষ্ট মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এটা সত্যিই আজ একটা জ্বলন্ত সমস্যা এবং সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান না হলে অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যকে গুণতে হবে বিরাট মাশুল। ভেঙে পড়বে আইন-শৃঙ্খলা যাও বা অবশিষ্ট রয়েছে। দেখা দেবে আরও বেশি করে মানুষের অস্তিত্বের সংকট।

চীন কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান চেয়ারম্যান মাও সে তুং (মাও জে দং) মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাস হলেও তাঁরও ছিল নিজস্ব মতবাদ বা জমিদার, সামন্তপ্রভু, পুঁজিপতি শ্রেণী। তাই এরাই হচ্ছে শ্রেণী শত্রু। তাই শ্রেণী শত্রু খতম ভিন্ন শ্রেণীহীন সমাজ (সাম্যবাদ) এবং সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তিনি আরও বলেছেন—বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। তাই রক্তাক্ত বিপ্লব ব্যতিরেকে ক্ষমতা দখলও অসম্ভব। অবশ্য তাঁর দৃষ্টিতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরাও ছিলেন শ্রেণী শত্রু। কাজেই যারা মাওয়ের এই মতবাদ বা তত্ত্বে বিশ্বাসী তারাই মাওবাদী।

শ্রেণী শত্রু খতমের মাধ্যমে শ্রেণীহীন সমাজ গঠন এবং সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই মাওবাদীরা রক্তাক্ত বিপ্লব সংঘটিত করে চলেছে। এদেশ বা এ রাজ্যেও তার অন্যথা হচ্ছেনা। তথাকথিত শ্রেণী শত্রু খতম অভিযান রয়েছে অব্যাহত। লাশ পড়ছে, রক্ত ঝরছে। মাওবাদের উৎপত্তি যে চীনে, সেই চীনেই মাও আজ ব্রাত্য—মাওবাদ পরিত্যক্ত অথচ বিশ্বের মাওবাদী বিপ্লবীরা চীনকেই করে অনুসরণ। মাওবাদ প্রসারে চীন থেকেই আসে নির্দেশ, অর্থ ও অস্ত্র। অন্যান্য দেশের মাওবাদীদের ন্যায় এদেশের মাওবাদীরাও মৃত মাও ও তাঁর মতবাদকে আজও বুকে আঁকড়ে ধরে আছে। আর খতম করছে 'শ্রেণী শত্রু' জোতদার, পুঁজিপতি, পুলিস, প্রশাসক ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে রেললাইন, প্রশাসনিক ভবন, স্কুল, সেতু, টাওয়ার ইত্যাদি। চীনপন্থী সিপিএমও তাদের দৃষ্টিতে শ্রেণীশত্রু।

যদিও চীনে এখন বইছে বিশ্বায়নের খোলা হাওয়া, শিল্পপতিদের পছন্দের দেশ এখন চীন, সাম্যবাদ প্রায় তলানিতে ঠেকেছে, তবুও তারা সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাওবাদীদের যোগাচ্ছে মদত। আসলে সাম্রাজ্যবাদী চীন গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, জোট নিরপেক্ষ ও সমৃদ্ধ ভারতকে সহ্য করতে পারছেনা। তাই ৬২ সালে সে ভারত আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছে ১৪ হাজার বর্গ কিমি ভারতীয় ভূখণ্ড। এখন সে নিজেদের অংশ বলে দাবী করছে অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, দার্জিলিং ও কাশ্মীরের একটা বড় অংশকে। ইতিপূর্বে সে দখল করেছে তিববত, ঝিনঝিয়াং প্রভৃতি দেশকে। দীর্ঘদিন ধরেই সে ভারতকে ভিতর ও বাইরে থেকে ধবংস করতে তৎপর। তাই সে একদিকে যেমন সাহায্য যোগাচ্ছে মাওবাদী, উলফা প্রভৃতিকে তেমনি অন্যদিকে সাহায্য করছে ইসলামি জঙ্গিদেরও। 'পঞ্চ শীল' নীতি ও নেহরু প্রণীত 'হিন্দি-চিনী ভাই ভাই' কবেই পটল তুলেছে। ভারতের, বিশেষত পশ্চি মবঙ্গের শিয়রে যখন এহেন শমন তখন যুযুধান দুটি দল সি পি এম ও তৃণমূল কংগ্রেসের দুই নেতা-নেত্রী বুদ্ধ দেব ও মমতা মাওবাদী সমস্যা নিয়ে জড়িয়ে পড়েছেন রাজনৈতিক তরজায়। সমস্যা যখন এরাজ্যের তখন তার সমাধানের উপায় বের করা তো দূরের কথা, উল্টে পরস্পরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতেই তাঁরা ব্যস্ত। বুদ্ধ বাবুরা বলছেন—তৃণমূল ও মাওবাদীদের মধ্যে রয়েছে গোপন বোঝাপড়া। তা না হলে তৃণমূল নেত্রী মাওবাদীদের প্রতি এত নরম মনোভাব দেখাচ্ছেন, কেন? কেন তিনি ছত্রধর মাহাত, কিষেণজিদের সম্পর্কে নীরব? আর কেনই বা ছত্রধরের গ্রেপ্তার, যৌথবাহিনীর অভিযানের বিরোধিতা করছেন তিনি? এসব কী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়? প্রত্যুত্তরে মমতারা বলছেন—সর্বহারার নেতারা তেত্রিশ বছর ক্ষমতায় থাকার পরেও কেন জঙ্গলমহলের মানুষেরা শোষিত, বঞ্চি ত ও নিপীড়িত? তাদের উন্নয়নে কেন কোন কিছুই করা হয়নি এতদিন? প্রতিবাদীদের পিঠে কেন মাওবাদী ছাপ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মাওবাদী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে? ছত্রধর তো একদা বামপন্থী (সিপি এম) ছিলেন। তিনি কেন এখন সি পি এম বিরোধী? কিষেণজিকে নাগালের মধ্যে পেয়েও কেন ধরা হলনা? আসলে মাওবাদী-সিপি এম ভাইভাই। সিপিএমই মাওবাদীদের নিয়ে রাজনীতি করছে।

সত্যি বলতে, মাওবাদীদের শিখণ্ডী করে সিপিএম-তৃণমূল সাজাচ্ছে রাজনৈতিক খুঁটি।

ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

চিঠিপত্র

চাই নির্ভীক নিরপেক্ষ সংবাদ

রণজিৎ সিংহ

সংবাদপত্র সোজা বাংলায় খবরের 'কাগজ' জনমত গঠন ও জনমত প্রচারের বলিষ্ঠ মাধ্যম। কোনও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা পাঠকদের বিচার-ভাবনা পরিষ্কার না হলে, ত্রাতা সংবাদপত্র। বিশেষ প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় মন্তব্য পড়ে পাঠকেরা। সেই আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের আগে এবং আন্দোলন চলাকালীন সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল খুবই গৌরবের এবং বলিষ্ঠতার। তখন এখনকার মত বিজ্ঞাপন, পাঠক-গ্রাহকের এত প্রাচুর্য ও আনুকূল্য ছিল না! কিন্তু সত্য প্রকাশে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক কোনও পত্রিকাই কার্পণ্য দেখাত না! সংবাদপত্রের স্ব-ধর্ম পালনে সবাই ছিল নীতিনিষ্ঠ এবং আপন মহিমায় সমুজ্জল।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্বে বীর বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'যুগান্তর' এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যার' কথা। হাজার প্রলোভনেও তাঁরা সত্যচ্যুত হন নি! বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর শত অত্যাচার-নির্যাতন, সহ্য করে, কোনও অবস্থাতেই মাথা নত না-করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা বলে গেছেন এবং মুক্তির জয়ধবনি দিয়েছেন। এই রকমই ছিল ভূপেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধবের ব্যক্তিত্ব ও সুদৃঢ় মানসিক কাঠামো। দেশ খণ্ডিত স্বাধীনতা পাওয়ার পরেও কিছুমাত্র সেই স্থান অধিকার করে নিয়েছিল অধুনালুপ্ত 'দৈনিক বসুমতী' ও 'যুগান্তর'।

সেই উচ্চ পরম্পরার ধারা অনুসরণ করে বর্তমানে প্রচলিত সংবাদপত্রগুলো দেখলে সত্যিই বেদনার্ত হতে হয়। সংবাদপত্রের সেই উচ্চ মান, নির্ভীক

জ ন ম ত

সাংবাদিকতার বিন্দুমাত্র এদের মধ্যে দেখা যায় না। পক্ষপাত ও চাটুকারিতার প্রতিযোগিতায় নিমগ্ন অধিকাংশ সংবাদপত্র। সেই সঙ্গে চটুল বিজ্ঞাপন প্রচার লক্ষ্য করলে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন জাগে, সংবাদপত্রের লক্ষ্যটা কী? মনে হয় বর্তমানে অর্থ রোজগারই সংবাদপত্রের একমাত্র ও অদ্বিতীয় ধর্ম। এখানে কোনো ধরনের নৈতিকার প্রশ্ন তোলা অরণ্যে রোদন।

বর্তমানে আমাদের প্রদেশ পশ্চি মবঙ্গে বামফ্রন্ট দীর্ঘ ৩০ বছরের ওপর রাজ্যশাসন করে চলেছে, যেখানে প্রাধান্য একটি বড় দলের। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ফলে এই সরকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে!! শাসক গোষ্ঠীর ছোট বড় সকল নেতা-মন্ত্রীরা অনেক ক্ষেত্রেই সোজা-সাপ্টা এই সত্য ঘটনা স্বীকার করতে না চাইলেও বাস্তবে এটা প্রমাণিত। স্বাভাবিক কারণেই বিরোধিরা সরকারের এই কুশাসনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে এবং নানা ভাবে আন্দোলন করছে। এই মুহূর্তে দুটি দলের আহ্বানে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহেই 'বাংলা বনধ্' হয়ে গেল পরপর দুটো দিন। এদের বাইরে সবচেয়ে বড় বিরোধী শক্তি বহু আগেই সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন করেছে এবং আজও তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই বড় বিরোধী শক্তির আন্দোলনের প্রচার, প্রসার ও সমর্থনে সংবাদপত্র মেতে গেছে। এখানে কোনো বাছ-বিচার নেই!

সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বড় বিরোধী শক্তির নেতা-নেত্রী সর্বাংশে সততা, নীতিনিষ্ঠার, তাদের পূর্বের কথা ও কাজের সঙ্গে বর্তমান আচরণের কতটা ফাঁক-ফোকর দেখা যাচ্ছে, সে-বিষয়ে এই সকল সংবাদপত্র সম্পূর্ণ নীরব।

কোনো প্রশ্ন এই নেতা-নেত্রীদের কাছে রাখছে না! ধামাধরা হয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে এদের 'হলমার্কা' দিয়ে যাচ্ছে। যদিও গণতন্ত্রে শাসক গোষ্ঠীর কার্য-কলাপের সমালোচনার সঙ্গে বিরোধীদের ভুল-ত্রুটি দেখানোও প্রকৃত সংবাদপত্রের ভূমিকা! ফলে 'যথার্থ জনমত' গঠন দূর অস্ত! সরকারের বিরোধিতায় প্রকৃত বিরোধী নেতার কার্যকলাপ কি রকম হওয়া উচিত, বিরোধী নেতা পরিষ্কার সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন। শুধু সরকার নয়, বিরোধী পক্ষের, বিশেষ করে বড় বিপক্ষ দলের কার্যকলাপও কতটা সমালোচনা যোগ্য, তার আরও সংবাদ আমরা শীগ্‌গির জানতে পারবো। তাই চাটুকারিতা ও পক্ষপাতযুক্ত হয়ে সংবাদপত্র যত তাড়াতাড়ি প্রকৃত নিরপেক্ষ ভূমিকায় নামবে, পশ্চি মবঙ্গে গণতন্ত্র সবল ও সফল হবে—শাসন ব্যবস্থায় পরিচ্ছন্নতা ফিরে আসবে।

পরলোকে অনন্তলাল ঠাকুর

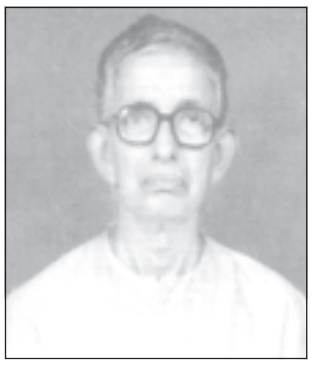

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত অনন্তলাল ঠাকুরের জীবনাবসান হয়েছে। গত ২৬ নভেম্বর রাতে হুগলী জেলার বৈদ্যবাটীর মালীরবাগানস্থ বাটীতে তিনি পরলোক গমন করেন। অভিভক্ত বঙ্গের ফরিদপুর জেলার প্রসিদ্ধ কোটালিপাড়ার উনশিয়া গ্রামে ১৩২৩ সালে তাঁর জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যায় বৈশেষিক দর্শন বিভাগে এম এ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। কর্মক্ষেত্র মিথিলা ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা ছাড়া ঐ প্রতিষ্ঠানের পুঁথিশালা বিভাগের দায়িত্বভার তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও বিহারের দ্বারভাঙা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেছেন কিছুদিন। পরবর্তীকালে এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালার অধীক্ষক হন।

লালবাহাদুর শাস্ত্রী ডিমড ইউনিভারসিটি থেকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান, ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এবং রবীন্দ্রভারতী কর্তৃক ডি লিট উপাধিও তিনি লাভ করেন। উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং বিহার সরকার তাঁকে পুরস্কার প্রদান করে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের উপর তাঁর রচিত অনেকগুলি পুস্তক রয়েছে। এরমধ্যে অনেকগুলি ফরাসি ও জার্মানিতে অনুবাদও হয়েছে। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন মহাভারত বিশেষজ্ঞ। মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী ও বিবাহিত কন্যা বর্তমান।

শ্রীচৈতন্য পরিকর শ্রীবাসপণ্ডিত

সুজলা কুণ্ডু

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ পার্ষদগণের মধ্যে পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণ অন্যতম পঞ্চ তত্ত্ব শ্রীবাস পণ্ডিতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর আদি বাসস্থান ছিল শ্রীহট্টের পঞ্চ খণ্ডে, পণ্ডিতপাড়ায়। পিতার নাম জলধর পণ্ডিত। পণ্ডিত তাঁদের কৌলিক উপাধি। জলধর পণ্ডিতের পাঁচ পুত্র—শ্রীনলিন পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীপতি পণ্ডিত, শ্রীনিধি পণ্ডিত। শ্রীবাস পণ্ডিত ছিলেন জলধর পণ্ডিতের দ্বিতীয় পুত্র। শ্রীবাস পণ্ডিতের দ্বিতীয় ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা শ্রীমতী নারায়ণী দেবী ছিলেন শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচয়িতা 'কলিযুগের ব্যাসদেব' শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মাতা। পরবর্তীকালে শ্রীবাস পণ্ডিত বাসস্থান পরিবর্তন করে সপরিবারে নবদ্বীপে এসে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর পত্নীর নাম মালিনী দেবী।

তিনি সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত অত্যন্ত উদ্দাম প্রকৃতির ছিলেন। একদিন এক সন্ন্যাসী তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন—"শ্রীবাস তুমি কি করিতেছ? তোমার আয়ু আর এক বৎসর মাত্র আছে।" ভোরে ঘুম থেকে উঠে শ্রীবাস দেখলেন স্বপ্নে দৃষ্ট সেই সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন এবং তিনিও তাকে সেই সতর্কতাসূচক উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। সেদিন থেকে শ্রীবাসের সকল আনন্দ এবং চঞ্চ লতার অবসান হল। একদিন হঠাৎ তিনি পথে বৃহন্নারদীয় পুরাণোক্ত একটি শ্লোক লেখা এক টুকরো কাগজ কুড়িয়ে পেলেন। শ্লোকটি—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা॥

তিনি শ্লোকটি পেয়ে নিরন্তর নাম জপ করতে করতে ক্রমশ তাঁর মনে আধ্যাত্মিক শক্তির সঞ্চ ার হল। তিনি যখন ভক্তির আবেগে অতি সুমধুর কণ্ঠে নাম কীর্তন করতেন তখন সেখানে বহু শ্রোতার সমাগম হতো। সেই সময় নবদ্বীপে দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রত্যহ শুনতে যেতেন তিনি। একদিন প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ হচ্ছিল। যথারীতি দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহে শাস্ত্র পাঠ শুনতে গিয়েছিলেন। সেদিন ছিল সন্ন্যাসীর নির্দিষ্ট এক বছরের শেষ দিন। পাঠ শুনতে শুনতে তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। তাকে সবাই মৃত মনে করে বাইরে নিয়ে এলেন। এমন সময় কোথা থেকে সেই সন্ন্যাসী এসে তাঁর মাথায় চাপড় মেরে বললেন "শ্রীবাস ওঠো, জগতে তোমার আরও অনেক কাজ করবার আছে—তুমি নবজন্ম পাইলে।" পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে একদিন বলেছিলেন—

স্পর্শমনে স্পর্শবশাৎ কনকীভাবং
প্রজাতমিব লৌহং।
ভবতু তদেব শরীরং নারদ শক্তিঃ
প্রবেশতোহন্যদিব॥

সেদিন শ্রীবাসের শরীরে নারদশক্তি সঞ্চ ারিত হয়ে শ্রীবাসের পুনর্জন্ম হল মর্তে দেবর্ষি নারদরূপে।

শ্রীনৃসিংহ অবতারের পূজারী ছিলেন শ্রীবাস। একদিন রাত্রিতে যখন তিনি ধ্যানে নিবিষ্ট। তখন ব্রহ্মভাবে উদ্দীপিত শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবাসের আঙ্গিনায় উপস্থিত হয়ে হুঙ্কার দিলেন—'যাহারে পূজিস তারে দেখ্ বিদ্যমান।'—ভীত স্তব্ধ শ্রীবাস দেখলেন—ইনি তো জগন্নাথ সূত বিশ্বম্ভর নয়, চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র, গদা-পদ্মধারী স্বয়ং নারায়ণ। দিব্যভাবে আত্মবিস্মৃত শ্রীচৈতন্যদেব ভীত ভক্তকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"তোর কোন চিন্তা নাই কর মোর স্তব।" ভাবমুগ্ধ শ্রীবাস মহানন্দে স্তব পাঠ করতে লাগলেন। শ্রীচৈতন্যের দিব্যরূপ দর্শনে ধন্য হলেন শ্রীবাস ও তাঁর পরিজনবর্গ।

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীবাস অঙ্গনের লীলা থেকে বুঝা যায় শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে কিরূপ স্নেহ করতেন। চৈতন্যদেবের ভক্তি লীলা প্রকাশ হবার

পরেই শ্রীবাসের বিস্তৃত আঙ্গিনায় প্রতিদিন রাত্রিকালে একটি বিশিষ্ট ভক্তদল নিয়ে কীর্তন হত। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই আঙ্গিনায় যে লীলা হতো তা দেবলীলা, সে আঙ্গিনা এখন গঙ্গাগর্ভে, কিন্তু অদূরবর্তী একটি স্থানকে "শ্রীবাসের আঙ্গিনা" নাম দিয়ে ভক্তরা এখনও সেই পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করেন। শ্রীবাসগৃহিনী নলিনী দেবীও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের সেবা করে গিয়েছেন। নামগোত্রহীন অবধূত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ যখন নবদ্বীপে প্রথম এলেন তখন চৈতন্যদেব শ্রীবাসের গৃহেই তাঁর আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু মালিনী দেবীকে মা বলে ডাকতেন।

একদিন শ্রীবাস অঙ্গনে চৈতন্যদেব তাঁর পার্ষদদের নিয়ে কীর্তনানন্দে মগ্ন ছিলেন এমনই একসময় শ্রীবাসের শিশুপুত্রের মৃত্যু হল। স্ত্রীলোকেরা তারস্বরে ক্রন্দন করে উঠে। শ্রীবাস বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখেন ক্রন্দনরতা মালিনী দেবী শিশুপুত্র কোলে নিয়ে ব্যস্ত এবং পরিবারস্থ সকলে কান্নার রোল তুলেছেন। ক্রন্দনের শব্দ শুনতে পেলে চৈতন্যদেবের কীর্তনের বিঘ্ন হবে ভেবে শ্রীবাস দৃঢ়তার সাথে সকলকে বললেন যে কোনরূপ শব্দ যেন না হয়। যদি কীর্তনে বাধা জন্মায় তবে তিনি জাহ্নবী সলিলে প্রবেশ করবেন। শুধু তাই নয়, শ্রীবাস পণ্ডিত পুত্রশোক উপেক্ষা করে শ্রীঅঙ্গনে এসে পুনরায় কীর্তনে যোগদান করলেন। শ্রীচৈতন্যদেব পরে এই দুর্ঘটনার খবর শুনে সর্বসমক্ষে শ্রীবাসের মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন এবং মৃতপুত্রকে আশীর্বাদ করে তাঁকে দিয়ে কথা পর্যন্ত বলিয়েছিলেন। সেই শিশুপুত্র তখন মানবজীবনের অসাড়তা সম্বন্ধে এবং নিয়তির লিখন সম্বন্ধে উপদেশ মূলক কথা বলে নীরব হয়ে যান এবং পরে তাঁর দাহকার্য সম্পন্ন করা হয়।

চৈতন্যলীলার পূর্বে নবদ্বীপে শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ, গঙ্গাদাস, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, মুকুন্দ প্রভৃতি কয়েকজন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমানুরাগী শ্রীবাসের আঙ্গিনায় মিলিত হয়ে দ্বার রুদ্ধ করে কীর্তন করতেন। অদ্বৈত-আচার্য এ সময়ে নবদ্বীপে টোল খুলেছিলেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সৃষ্ট বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পাঁচজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি "পঞ্চ তত্ত্ব" নামে পরিচিত হতেন। তাঁরা হলেন শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত ও পণ্ডিত গদাধর। শ্রীবাস পণ্ডিতের অঙ্গনে তিনজনের নেতৃত্বে তিন দলের কীর্তনের ব্যবস্থা করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। এই তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হলেন—শ্রীবাস পণ্ডিত, মুকুন্দ ও গোবিন্দ দত্ত। কাজী দলনের দিনে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, হরিদাস এবং শ্রীবাসকে নিয়ে তিনটি কীর্তনের দল গঠিত হয়েছিল। এই অভিযানটি অনেকটা ছিল আধুনিক কালের আইন অমান্য আন্দোলনের মতো।

শ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামে জগন্নাথ মন্দিরে যখন নৃত্য ও সঙ্কীর্তন করতেন তখন তাঁর চারদিকে চারটি কীর্তন সম্প্রদায় তাঁকে বেষ্টন করে কীর্তন করতেন, এই চারটি কীর্তন সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রীনিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত ও শ্রীবাস পণ্ডিত। মাঝখানে থাকতেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব। নাম সঙ্কীর্তনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেব রায় রামানন্দকে বলেছিলেন—"নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়"।

শ্রীবাসকে বলা হয় নারদের অবতার। শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ গ্রন্থে দেখা যায় যে দেবর্ষি নারদ তাঁর শ্রীহস্তে বীণাটি ধারণ করে ত্রিভুবনময় হরিগুণগান করে বেড়ান। সেরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী ভগবানের মহিমা প্রচার করে গেছেন শ্রীবাস পণ্ডিত। এবং এই কার্যের মাধ্যমে তিনি তাঁর নামের সার্থকতা রক্ষা করেছেন। তাঁর দেহ সমাধি বলে কিছু না থাকলেও তিনি যে আদর্শ রেখে গেছেন তা মানুষকে চিরকাল ভক্তিপথে প্রেরণাই যোগাবে তা নয়, নবদ্বীপ ধামে শ্রীবাস অঙ্গন আজও তাঁর নীরব সাক্ষীরূপে বিরাজিত।

তিনি জাতিকে এই শিক্ষাই দিয়ে গেলেন—প্রভু অপ্রকাশ নয়, নাম সঙ্কীর্তনের মধ্যেই তিনি স্বপ্রকাশ। এই সংকীর্তনই মানুষকে একতাবদ্ধ হতে ও ভালবাসতে শেখায়। তাই আজ বৈষ্ণব ধর্মের এত প্রসার।

ঈশ্বরপুরুষের রঙ্গরস শ্রীশ্রী সারদাদেবী

বৈদেহীনন্দন রায়

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মায়ের মন্দির থেকে ফিরছেন মন্দির প্রাঙ্গণে উত্তর পশ্চিমের আপন কক্ষে। অর্ধবাহ্যদশার আবেশে তখনও আচ্ছন্ন কিছুটা। চলার গতি টলমল। মা সারদাদেবী সেখানে কোনও কার্যোপলক্ষে এসেছেন। মা সারদাকে স্পর্শ করে বললেন—ওগো আমি কি মদ খেয়েছি। টলছি কেন তবে?

মা শশব্যস্তে বললেন—সে কি কথা! তুমি মদ খাবে কেন?। তুমি তো মা কালীর ভাবামৃত খেয়েছো। তাই এমন হচ্ছে।

ঠাকুরের মুখে মৃদু হাসি।

স্থানঃ কামারপুকুর। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন গ্রামে। সেখানে ঠাকুরের জন্য রান্নার ভার ছিল মা সারদা ও লক্ষ্মীর মায়ের ওপর।

একদিন ঠাকুর ও হৃদয় খেতে বসেছেন। লক্ষ্মীর মায়ের রান্না ঠাকুরের পছন্দ। তিনি যা রেঁধেছেন, ঠাকুর খেয়ে ভাগ্নে হৃদয়কে বললেন—ও হৃদু যে রেঁধেছে এ রামদাস বদ্যি। আর তোর খুড়ি (সারদা মা) যেটা রেঁধেছে সেটা ছিনাথ সেন। অর্থাৎ হাতুড়ে শ্রীনাথ সেন। শুনে হৃদয় বলে—তা বটে। তবে তোমার এ হাতুড়ে বদ্যি সব সময় পাবে। গা-পা টিপতে পর্যন্ত। ডাকলেই হয়। আর রামদাস বদ্যি। তার ভিজিট অনেক। তাকে তো সব সময় পাবে না। আর লোকে আগে হাতুড়েকে ডাকে।

মা ভক্তদের এই কাহিনী শোনাচ্ছেন আর হাসছেন। স্থান ঃ জয়রামবাটি। মা জ্বরে আক্রান্ত। জ্বরে ভাত খাওয়া নিষেধ। বদ্যির কথামতো মাকে পথ্য হিসাবে সাবু দেওয়া হয়েছে। অন্যসময় ভক্তরা মায়ের ভুক্তাবশেষ প্রসাদ হিসেবে পাওয়ার জন্য উৎসুক থাকে। মা তাদের আশা পূর্ণ করেন। এখন তাদের উৎসাহহীন দেখে মা বললেন—কি গো আজ প্রসাদে ভক্তি নেই কেন?

একদিন প্রসন্ন মামার ঘরে মা পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। প্রকাশ মহারাজ কিছু পদ্মফুল এনেছেন মায়ের চরণ বন্দনার জন্য। মায়ের পায়ে তা অর্পণ করে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলছেন, মা আমায় আর ঘোরাবেন না।

মা শুনে উত্তর দিলেন—বাবা, আমাকে ছেড়ে এতদিন ঘুরতে পারলে, আমি একটু ঘোরাবো না।

গণেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন—শ্রীশ্রীমা প্রকৃত সাধুকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করলেও, গৈরিকের অভিমানে স্ফীত হয়ে যদি কেউ কথায় বা আচরণে গৃহী ভক্তকে অবজ্ঞা করত, তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। এরূপ কোন গৈরিকধারী প্রসঙ্গে বলেছিলেন—বামুনের ছেলে সন্ন্যাসী হলে হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো হয়। আর সন্ন্যাসীর রাগ-অভিমান থাকলে বেতের রেফ (চাল মাপার পাত্র) চামড়া দিয়ে বাঁধানো হয়।

সূত্র ঃ ১। স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত শ্রীশ্রীসারদা দেবী। ২। অক্ষয় চৈতন্য প্রণীত—শ্রীশ্রীসারদা দেবী

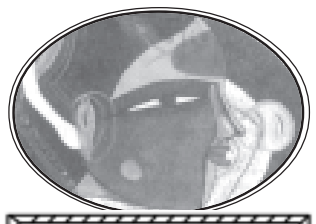

অঙ্গনা

স্মৃতির অতল থেকে উঠে আসা কনকলতা

ইন্দিরা রায়

কালের স্রোতে একসময়ের সাফল্য, কীর্তি, বিশেষ ঘটনা হারিয়ে যায়, পড়ে থাকে শুধু স্মৃতি। সেই স্মৃতির অতলে হাতড়ে উঠে আসে নানা মণি-মুক্তো, যার ভেতর দিয়ে পুরনো দিনের সক্রিয় উজ্জ্বল দিনগুলো হীরের দ্যুতির মত উঠে আসে একে একে। তখনই আমাদের উচিত সে সব প্রতিভাময়ী গুণ সমৃদ্ধ বিশিষ্ট জনদের জনসমক্ষে তুলে ধরা। এবারে থাকছে সে সময়কার অর্থাৎ পাঁচ/ছয় দশকের দাপিয়ে বেড়ানো বিশিষ্ট স্বনামধন্যা অভিনেত্রী কনকলতা, কনকলতা চ্যাটার্জি।

উত্তর কলকাতার পুরনো পাড়া কাশী মিত্র ঘাট স্ট্রিটে একটি পুরনো বাড়ির ঘরে বাস করেন। শারীরিক অক্ষমতায় এখন কোথাও যেতে পারেন না। সবসময়ের সঙ্গী এখন ওনার সঙ্গের যষ্টিটি আর স্মৃতির সরণি। তাঁর জীবনের 'সুবর্ণযুগ' সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি স্মৃতির অতলে চলে গিয়ে কুড়িয়ে আনেন সে সব কথা।

ছোটবেলাতেই গান-নাচ-এ শিক্ষা শুরু হয়। কলকাতায় আহিরীটোলার শেখপাড়ায় ছিলেন। এরপর বাবার বদলি চাকরির জন্য চন্দননগরে চলে যান। এখানে পাড়ায় ক্লাব ছিল। ওখানে সখে অভিনয় করতেন। ওখানকারই স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন পান্নালাল ভট্টাচার্য। উনি নিজে ছিলেন অভিনেতা। উনি ছোট্ট কনককে অভিনয়ে নিয়ে আসেন। ভালই চলছিল দিনগুলি। হঠাৎ বাবার মৃত্যু জীবনের পট সম্পূর্ণ বদলে দিল। মাত্র আট বছরের মেয়ে কনকলতা। সংসারের দায়িত্ব নেবার সময় হল। তখন থেকেই শুধুমাত্র অভিনয়ে যোগ দেন সংসারের জন্য, সেই সময় থেকেই অভিনয় হয়ে ওঠে তাঁর পেশা। চন্দননগর থেকে ফিরে এসে মিনার্ভা থিয়েটারে মিলন দত্তের সান্নিধ্যে আসেন। নববই টাকা বেতনে মিনার্ভায় যোগ দেন। পরে মুনলাইট থিয়েটারে যোগ দেন। হিন্দি নাটকে মেয়েরা তখন খুব আসত না। কনকলতার অভিনয় দেখে তখনকার প্রখ্যাত শিল্পীরা বাংলাতেও বাংলা নাটকে কনকলতাকে অভিনয় করার কথা বলেন। তখন থেকে আশি টাকায় বাংলা নাটকে অভিনয় করতে শুরু করেন। হিন্দি ও বাংলায় অভিনয় করতে গিয়ে কোন কোন শিল্পীকে পেয়েছিলেন এবং তাদের সম্পর্কে ধারণা কি হয়েছিল—এ প্রসঙ্গে স্বতস্ফূর্ত ভাবে বলে চললেন, "আমি যে সব শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করেছি, তাঁদের কথা কীভাবে বোঝাব সে ভাষা আমার নেই। প্রথমত আমার বয়স ছিল অনেক কম; ফলে তাঁরা আমার অভিভাবকের মত ছিলেন। তাঁরা যে স্নেহ করেছেন, যেভাবে নজর রাখতেন সে সব কথা চিরদিন মনে রাখার মত। অভিনেত্রীরা যেমন, সরযূ দেবী, মলিনা দেবী, প্রভামা, রাণীবালা, কেয়া চক্রবর্তী প্রমুখ। অভিনেতা

কনকলতা চট্টোপাধ্যায়

অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, জহর গাঙ্গুলি ছিলেন অভিভাবক স্বরূপ। সুতরাং তাঁদের তত্ত্বাবধানে থেকে তাঁদের 'গুরু' হিসেবে মেনে নেওয়াতে আমার অনেক কিছু শিক্ষালাভ হয়েছে।"

মিনার্ভার পর যোগ দেন স্টার থিয়েটারে। ওখানে পাঁচ বছর অভিনয় করেছিলেন। কনকলতা প্রথমদিকে ছিলেন মঞ্চ াভিনেত্রী, পরে হন যাত্রাভিনেত্রী। যাত্রায় কীভাবে আসা—জানালেন কনকলতা, 'নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় আমার স্বামী। তিনি ছিলেন যাত্রাভিনেতা। তিনিই আমাকে নিয়ে আসেন যাত্রায়। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, আমার মঞ্চে অভিনয় দেখে ভাল লাগে শ্বশুরমশায়ের এবং তিনি পছন্দ করে পুত্রবধূ করেন। যাত্রায় প্রথম অভিনয় ৬৪'তে নবযুগ নাট্য কোম্পানিতে। পরে দুলাল চট্টোপাধ্যায় ও আমি মিলে 'শ্রীমা নাট্য কোম্পানি' নামে একটি যাত্রা দল খুলেছিলাম। এই দলে বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেছেন সে যুগের দিকপালরা—মহেন্দ্র গুপ্ত, বিপিন গুপ্ত, জহর রায়, অরুণ দাশগুপ্ত, শান্তি চক্রবর্তী প্রমুখ। এই দলের জনপ্রিয় পালাগুলো হল—বৈকুণ্ঠের উইল, তৃষ্ণা, বিরাজ বউ, ওমর খৈয়াম, চাঁদ বিবি, ক্ষুধিত পাষাণ, সুবর্ণ গোলক আরো অনেক। নিজের দলে নিজের প্রথম অভিনয় 'বৈকুণ্ঠের উইল-এ।"

একটানা চৌদ্দ বছর শ্রীমা নাট্য কোম্পানি পালা অভিনয় করেন। নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরও কনকলতা অভিনয় করে যান। শেষ অভিনয় ২০০৫-এ মঞ্চ এবং যাত্রায়। যাত্রায় শেষ অভিনীত বই 'বিদায়লগ্নে মায়ের ডাক' শিল্পী নিকেতন পালায়। কনকলতার অভিনয় জীবনে উৎপল দত্তের সান্নিধ্য ছিল। উৎপল দত্তের 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ মিনার্ভায় প্রথম অভিনয়। উৎপল দত্তের কাছে এসে অভিনয় সম্পর্কে কী শিক্ষালাভ করেন, প্রত্যুত্তরে কনকলতা জানালেন ঃ মিলনদা প্রথমে উৎপলদার কাছে নিয়ে আসেন। তখন পি. এল. টির নাম ছিল এল. টি. জি.। মিনার্ভায় ওনার অনেক বইতে অভিনয় করেছি। শেষ ছবি (পি. এল. টি.)-র 'নটি' সে সময়ে উৎপলদা ছিলেন না। তাঁর কাছে অভিনয় শিক্ষা পেয়েছি। উনি আমার গানের গলা পছন্দ করতেন। উনি বলতেন, কনক যে স্কেল থেকে গান করে, মিউজিশিয়ানরা সেখানে ধরবে। উনি বেঁচে থাকলে আরও অনেক কিছু শেখা যেত।

গান ও নাচ শিখেছেন বিশিষ্ট শিল্পীদের কাছে। গানের শিক্ষক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, পান্নালাল মিত্র, দুর্গা সেন। নাচের তালিম নিয়েছেন গোপালজি, যমুনা পাণ্ডের কাছে। যাত্রা ও মঞ্চে বহুবার নাচ করিয়েছেন এবং নির্দেশনাও দিয়েছেন। দীর্ঘ অভিনয় জীবনে পুরস্কার প্রাপ্তির তালিকাও কম নয়। কিন্তু অন্তরালে থাকা এই অক্ষম শিল্পীর অভিমান এখানেই যে, দুঃস্থ শিল্পী হিসেবে যে সাহায্য সরকার করে, তা সামান্য। আর কিছু ক্ষেত্রে কোনও সাহায্য নেই। পি. এল. টি. মাঝে মাঝে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। কিন্তু শারীরিক অক্ষমতা এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য একটা মনে কষ্ট পান। বিগত শিল্পী হিসেবে কিছু সাহায্যের আশা থাকতেই পারে, কারণ সমাজে তাঁদের কাজ সত্যিই একটা সাংস্কৃতিক অবদান।

।। চিত্রকথা।। শ্রেষ্ঠ শিষ্য একলব্য।। ১।।

একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী মঞ্চে উপবিষ্ট অধিকারীবৃন্দ।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম, দক্ষিণবঙ্গ পরিচালিত ১৬তম একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বাঁকুড়া জেলার ঝিলিমিলি উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে ২৯ নভেম্বর সমাপ্ত হল। গত অক্টোবর মাস থেকেই এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ব্লকস্তরে শুরু হয়েছিল। এই বৎসর ৫২টি ব্লকে এবং ১২টি জেলায় খেলা হয়।ব্লক স্তরে ২২২৪ জন, জেলা স্তরে ১৯৪২ জন এবং প্রান্তস্তরে ২০৩ পুরুষ ও ১০৯ মহিলা মোট ৩০৯ জন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করে।

প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীকান্ত হাঁসদা মহাশয়। প্রধান অতিথি ছিলেন দিলীপ রায়, যিনি পঃবঃ খো-খো অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান। বিশেষ অতিথি জীবেন রায় মহাশয় (প্রাক্তন হার্ডলস রানার এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্লু') প্রাস্তাবিক ভাষণ দেন পূর্ব ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক ডাঃ রামগোপাল গুপ্তা। এই প্রতিযোগিতায় ১৮টি পদক পেয়ে ১ম স্থান অধিকার করেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা, দ্বিতীয় পূর্ব-মেদিনীপুর জেলা ১৬টি পদক, যুগ্মভাবে তৃতীয় ১২টি পদক পেয়ে পূর্ব-পুরুলিয়া ও বীরভূম জেলা। খো-খো প্রতিযোগিতায় বাঁকুড়া জেলা বিজয়ী এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা রানার্স হয়েছে। তীরন্দাজীতে সর্বোচ্চ ৫০৫ পয়েন্ট পেয়ে চন্দ্রাই হেমব্রম ১ম স্থান দখল করেছে।

আগামী ২৮, ২৯, ৩০ ডিসেম্বর অখিল ভারতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হিমাচল প্রদেশের সোলন শহরে অনুষ্ঠিত হবে। প্রাদেশিক স্তরে যারা ১ম স্থান অধিকার করেছে তারাই অখিল ভারতীয় স্তরে প্রতিযোগিতার জন্য যেতে পারবে।

সমাজতান্ত্রিক অসমের স্বপ্ন চুরমার হচ্ছে

(৬ পাতার পর)

অসমে সক্রিয় মুসলিম জেহাদি গোষ্ঠী, যারা কোনও না কোনওভাবে আল কায়েদার সঙ্গে সংযুক্ত। একটি হল মূলটা (মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন টাইগার্স অফ অসম) এবং অন্যটি মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ অসম। অস্ত্রশস্ত্রের মূল লেনদেনটা বাংলাদেশের মাটিতেই হত। অসম-বাংলাদেশ বর্ডারের যাতায়াতের পথগুলো জানাজানি হওয়ার ফলে উলফা নেতৃত্ব মেঘালয়ের পশ্চিম গারো পার্বত্য জেলায় একটা ঘাঁটি বানায়। সেখান দিয়েই বাংলাদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করা হোত।

বাংলাদেশে থেকেই উলফা নেতারা পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলে। আই এস আই উলফার কমাণ্ডার ইন চীফ (সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পরেশ বরুয়া) এবং অন্যান্য অনেকের নামে একাধিক আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট বানিয়ে দেয়। পাকিস্তানে গিয়ে আই এস আইয়ের কাছে উলফা ক্যাডাররা সশস্ত্র সন্ত্রাসী কার্যকলাপের প্রশিক্ষণ নেয় পাক-আফগান সীমান্তে। উলফার শীর্ষ নেতৃত্বের অনেকেই বাংলাদেশস্থিত পাকিস্তানী হাইকমিশনের নেকনজরে থেকে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলত। এখবর পুরনো। ওখান থেকেই পাসপোর্ট তৈরি করে উলফা ক্যাডাররা করাচী বন্দরে পৌঁছাত। গা-ছমছম করা গোয়েন্দা কাহিনীর মতোই এই চিত্রনাট্য। করাচী থেকে আই এস আই এজেন্টরা তাদের আই এস আই এবং তার দোসর পাক সেনাবাহিনীর সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ শিবিরে পৌঁছে দিত। উলফা ক্যাডাররা কারগিল যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল। তারাও পাকিস্তানের সুরে সুর মিলিয়ে ভারত ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশকারী পাক সেনা ও আফগান মুজাহিদিনদের স্বাধীনতা সংগ্রামী আখ্যা দিয়েছিল। আই এস আইয়ের অভিভাবকত্বে উলফা নেতাদের ছেলেমেয়েরা আমেরিকা ও কানাডায় পড়াশোনা করছে। উলফা নেতৃত্ব এক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের পীঠস্থান করেছে আমেরিকা-কানাডাকেই। অসমের সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েরা কোথায় পড়াশোনা করে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উলফার ওয়েবসাইট নিউজলেটার 'স্বাধীনতা'। স্বাধীনতা-র সম্পাদকীয় বিভাগ রীতিমতো সমর্থন পায় পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আইয়ের কাছ থেকে। আই এস আই উলফা ক্যাডারদের অস্ত্রশস্ত্র প্রশিক্ষণ, নিশ্চিন্তে নিরাপদ আশ্রয় তহবিল এবং সর্বোপরি সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র দিত। আই এস আইয়ের প্রত্যক্ষ মদতেই উলফা ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ চলত পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ভুটানে। অন্ততপক্ষে ৩০০ জন উলফা ক্যাডার রাওয়ালপিণ্ডি এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন লোকেশনে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ১৯৯২-৯৩ পর্যন্ত পরেশ বরুয়া নিয়মিতভাবে করাচী যাতায়াত করেছে। ১৯৯৬ সালে করাচীতেই পরেশ বড়ুয়ার সঙ্গে ওসামা বিন লাদেনেরও সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে সংবাদে প্রকাশ। লাদেনের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে 'আন্তর্জাতিক জেহাদ কাউন্সিল' তেহরিক উল জিহাদ, হরকত-উল-জিহাদি ইসলামি এবং আল কায়েদা সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। বিনিময়ে উলফা লাদেনকে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা জানা নেই। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে উলফার জন্য জাহাজ বোঝাই ১৪ ট্রাক অস্ত্রশস্ত্র এসে নেমেছিল— এখবর তখনকার খবরের কাগজে বের হয়েছিল বিস্তারিত ভাবে।

এখন ওপর ওপর মনে হচ্ছে উলফার শীর্ষ নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। একপক্ষ আলোচনার টেবিলে বসতে আগ্রহী। বিরোধিতায় মুখর একমাত্র পরেশ বরুয়া। পরেশ বিদেশ থেকে অসমের কাগজে মেল পাঠিয়ে অরবিন্দ রাজখোয়াকে হুমকি দিয়েছে— আলোচনায় না বসতে। কোমরভাঙ্গা উলফা কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে তা একমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারে। শেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী, অরবিন্দ রাজখোয়াকে গুয়াহাটি আদালতে তোলা হয়েছে এবং তিনি সেফ কাস্টডিতে রয়েছেন।

মাওবাদী রেড করিডর

(১ পাতার পর)

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। অপরদিকে এই রেড করিডরে নিজেদের নিরাপত্তা এবং ব্যবসা বজায় রাখতে গিয়ে বিভিন্ন কর্পোরেট হাউসগুলো মাওবাদীদের মোটা অঙ্কের টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছে। এই ফাণ্ডিং-এর ফলে মাওবাদীরা আরও বেশী আধুনিক অস্ত্র কিনে নিজেদের শক্তি বাড়াচ্ছে বলে সংবাদে প্রকাশ। যদিও এই টাকা লেনদেনের বিষয়ে কেউই মুখ খুলছে না। কিন্তু একসময় অসমে উলফা যেভাবে ফাণ্ড সংগ্রহ করতো একই পদ্ধতি অবলম্বন করছে মাওবাদীরা। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব জি কে পিল্লাই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ্যে বলেছেন, "চীনারা ছোট অস্ত্রের বিশাল চোরাকারবারী এবং সরবরাহকারী। আমার বিশ্বাস মাওবাদীরাও সেগুলো পায়"। চীন সরকারের এর পেছনে কোন ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি মনে করেন না বলে জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের এই মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—বিশেষ করে বর্তমান পটভূমিকায়। মায়ানমার হয়ে মিজোরাম দিয়ে ঢুকেছে চোরাই অস্ত্র। মিজোরাম চোরাই অস্ত্রের স্বর্গরাজ্য। বাংলাদেশ, চীন, মায়ানমারের সাথে পূর্বোত্তরের কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের দরুণ ক্রমশ ফুলে ফেঁপে উঠছে চোরাই বাণিজ্য। এদিকে আগে ল্যাণ্ডমাইন ব্যবহার করলেও মাওবাদীরা এখন উন্নততর প্রযুক্তির দিকে এগোচ্ছে। পূর্বোত্তরের জঙ্গি-গোষ্ঠীর থেকে আই ই ডি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে বলে সংবাদে প্রকাশ। যেভাবে সুপরিকল্পিতভাবে পূর্বোত্তরের জঙ্গিগোষ্ঠীদের সাথে আঁতাত এবং নিজস্ব বলয় তৈরি করছে মাওবাদীরা তাতে এই 'লাল আতঙ্ক' এর সাথে মোকাবিলা করতে নিরাপত্তা বাহিনীদের বেশ বেগ পেতে হবে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

আত্মসমর্পণে নারাজ কাশ্মীরী জঙ্গিরা

(১ পাতার পর)

এবছর একজন, ২০০৮-এ তিনজন সন্ত্রাসবাদী আত্মসমর্পণ করলেও এবছর মাত্র একজন সন্ত্রাসবাদী আত্মসমর্পণে রাজী হয়েছে আর অন্য সাতজন মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে মারা পড়েছে।

ডোডা জেলার পরিস্থিতি একটু ভিন্ন। গত তিনবছরে ৪০ জন সন্ত্রাসবাদী হিংসা ছেড়ে মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। ২০০৭-এ ২৪ জন। গত বছর ১০ জন এবং এ বছর ছয়জন উগ্রপন্থী হিংসার পথ পরিত্যাগ করেছে। দেশের এই তৃতীয় বৃহত্তম জেলায় গত তিনবছরে নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে সন্ত্রাসবাদী খতমের তালিকাটা ভালোই। ২০০৭-এ ৩১ জন, ২০০৮-এ ২৮ জন এবং এবছর নভেম্বর পর্যন্ত ৩০ জন।

জম্মু-কাশ্মীর সরকারের উগ্রপন্থী পুনর্বাসন প্রকল্পের নীটফল সরকারি সূত্রমতে, ২০০৬-এ ১৯০ জন, ২০০৭-এ ১২২ জন এবং ২০০৮-এ ৩৮ জন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে। ডোডার এস এস পি প্রভাত সিং-এর বক্তব্য, এই উচ্চ পার্বত্য জেলায় পুলিশকে খুব বুঝে-সুঝে চলতে হয়। তা না হলে দু'পক্ষেই অনেক জীবনহানির আশঙ্কা থাকে।

অন্য এক অফিসারের কথায়—এবছরই ডোডাতে ১৫ জন প্রথম সারির সন্ত্রাসবাদী মারা পড়েছে। তবে স্থানীয় মৌলবীদের একটু সাহায্য পেলে অর্থাৎ মৌলবীরা যদি যুবকদের মূল স্রোতে ফেরার কথা বলেন। তাহলে ভালো হয়। যদিও সেটা হবে বলে আদৌ মনে হয় না।

উধমপুর জেলায় এবছর মাত্র একজন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে এবং চারজন মারা পড়েছে।

ফারুক আব্দুল্লার সময়েই কাশ্মীরী সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্র সমর্পণ করলে নগদ অর্থ ও পুনর্বাসনের টোপ দেওয়া হয়েছিল। কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদী সেই সুযোগে যুগপৎ অর্থ ও চাকরীর সুযোগ নিয়ে নিরাপত্তাবাহিনীতে ঢোকে। পরে মেহবুবা মুফতি এবং ওমর আবদুল্লা নিরাপত্তাবাহিনী বাহিনীর হাতে নিহত সন্ত্রাসবাদীদের ক্ষতিপূরণ, শহীদের মর্যাদাদান এবং নিহতদের পরিবারবর্গকে পেনসন দেওয়ার প্রস্তাব বিধানসভায় পাস করিয়ে নেয়। উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে কাশ্মীরই একমাত্র রাজ্য যেখানকার বিধানসভায় কোনও আইন পাস হলেই তা কার্যকরী হয়, কেন্দ্র বা রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাগে না। উল্টে কেন্দ্রীয় আইনকে জরুরি অবস্থা ছাড়া কার্যকরী করাতে কাশ্মীর বিধানসভার মঞ্জুরী আবশ্যক।

অবশ্য জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য পুলিসের ডিজিপি কুলদীপ সিং খোড়া-র কথায় তাঁরা রাজ্যের সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে বেশি জোর দিচ্ছেন।

বর্ষসেরা মেসি-ই মারাদোনার উত্তরসূরী

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে তার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। প্রতিবেশী দেশের কাকা'ও কম যান না। আর্জেন্টিনার লায়নেল মেসি, ব্রাজিলের কাকা, পর্তুগালের ব্রাজিলজাত তারকা রোনাল্ডো—এই তিনজনই বর্তমান বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বর্ণময় চরিত্র। প্রতিভা, দক্ষতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে হলিউড নক্ষত্র, টেনিস ও গলফ তারকাদেরও পিছনে ফেলে দেন। আর এই তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? বিশ্ব জনমানস তোলপাড় করে উঠে এসেছে মেসির নাম। ২০০৯-র শ্রেষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে ফিফার সোনার বল পাচ্ছেন মেসি। সম্প্রতি ইউরোপে খেলা তারকাদের মধ্যে একনম্বর ফুটবলারের স্বীকৃতি পেয়ে মেসি প্রমাণ করেছেন এই মুহূর্তে এই গ্রহে তার সমকক্ষ কেউ নেই।

মনে পড়ে যায় গত বছরের বেজিং অলিম্পিকের কথা। আর্জেন্টিনাকে একার হাতে চাম্পিয়ান করেছেন বলা যায়। তবে তাকে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছিলেন দেবদূত মারাদোনার জামাই আগুয়েরা। পরপর দু'বার আর্জেন্টিনা অলিম্পিক ফুটবলের সোনা জিতে উরুগুয়ের রেকর্ড স্পর্শ করে। উরুগুয়ে গত শতকের তিনের দশকে পরপর দুবার অলিম্পিক সোনা জিতেছিল। আর অলিম্পিক সোনা জেতার পরই মেসির সঙ্গে মারাদোনার তুলনা টানা শুরু হয়ে যায় সর্বত্র। বছরের শেষে মেসির ফুটবল দ্যুতির বিচ্ছুরণে মোহিত ফিফা তাকে বিশ্ব ফুটবলের 'হল অব ফেমে' স্থান করে দিতে চলেছে।

খেলার জগৎ

মারাদোনার মতোই চোখ ধাঁধানো স্কিল মেসির। দু'পায়ে অসম্ভব ভাল টাচ্ আছে। চোরা গতির সঙ্গে নিখুঁত রোলিং স্কিল ও বল স্ক্রিনিং দিয়ে বাঘা বাঘা ডিফেন্ডারদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন ২৪ বছরের মেসি। স্পেনের বিশ্ব চাম্পিয়ন ক্লাব বার্সেলোনায় খেলেন। কাতালুনিয়ান সমর্থকদের নয়নের মণি মেসি। একটা ব্যাপারে টেক্কা দিয়েছেন তার 'গুরু' মারাদোনাকে। মারাদোনাও জীবনের সেরা ফর্মে বার্সেলোনায় খেলতেন। কিন্তু পারফরমেন্স ও জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের দোলাচলে ক্লাব সমর্থকদের মন জয় করতে পারেননি। বার্সেলোনাও ইউরোপ ও বিশ্ব ফুটবলে তেমনভাবে দাপট দেখাতে পারেনি। বাধ্য হয়ে মারাদোনাকে স্পেন ছেড়ে ইতালিতে চলে যেতে হয়। মেসি কিন্তু প্রথম বছর থেকেই স্পা-লিগেয় বর্ণময় চরিত্র হয়ে উঠেছেন।

এখন তাকে ছাড়া বার্সেলোনা ভাবাই যায় না। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রি দত্ত ম্লান হয়ে যাচ্ছে বার্সেলোনা থুড়ি মেসির উজ্জ্বল্যের কাছে।

কাকা, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, বেঞ্জিমা, রাউলের মত সোভিয়েট ফুটবলারদের নিয়ে গড়া টিম রিয়াল মাদ্রিদ। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ক্লাব অথচ স্পেনের ঘরোয়া লীগে মেসি, এটো, ইব্রামোভিচের বার্সেলোনা তাদের থেকে এখনই পাঁচ পয়েন্টে এগিয়ে কয়েক মাস আগে বার্সেলোনা ইউরোপীয়ান ক্লাব টিম চাম্পিয়ন হয়েছে মেসির দৌলতে। ম্যাঞ্চে স্টার ইউনাইটেড ডিফেণ্ডাররা ওই ম্যাচে মেসিকে আটকাবার কোনও রাস্তা খুঁজে পায়নি।

'ম্যান ইউ' বস স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন ওই ম্যাচের পর বলেছিলেন, মেসিকে সরিয়ে নিলে তার টিমকে কয়েকগুণ ওজনদার লাগবে বার্সেলোনার তুলনায়।

মেসি

তখন দশটার মধ্যে আটটা ম্যাচই জিতবে তার টিম। ইউরোপে এখন অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে বার্সেলোনা। বিশ্ববন্দিত রোনাল্ডিনহো গত বছর পযন্ত ছিলেন বার্সেলোনায়। তখন মেসি-রোনাল্ডিনহো যুগলবন্দী এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছিল ফুটবল পাগল কাতালুনিয়ানদের কাছে।

২০১০ দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপ কার হতে যাচ্ছে? ফিফা ও বিশ্ববাসীর কাছে এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। যদি সব কিছু ঠিকঠাক চলে তাহলে নিঃসন্দেহে মেসির বিশ্বকাপ হবে। তার খেলায় যে ছন্দ ধারাবাহিকতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ তা ছকে বাঁধা জীবনচর্চার পরিপাটি বুনোট তাতে চোট আঘাত পেয়ে ছিটকে না গেলে মেসিই হবেন মহানায়ক দক্ষিণ আফ্রিকার। ১৯৮৬-র পর আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জেতেনি। এর মধ্যে পরপর দুবার অলিম্পিক খেতাব জেতা হয়ে গেছে। বিশ্বকাপ জেতাই হবে আর্জেন্টিনার ন্যায়সঙ্গত বাস্তবতা। মেসি, তেভেজ, মাসকারানো, আগুয়েরা, রিকলমের মতো ফুটবলার যে দলে আছে তাদের চাম্পিয়ন না হয়ে ফেরাটা শোভা পায় না। আর মেসি নিজেও চাইবেন এই ট্রফিটা জিততে। তারজন্য সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাবেন। কারণ প্রশ্নাতীত ভাবে বিশ্বসেরা ফুটবলার অথচ বিশ্বকাপের গায়ে হাত ছোঁয়াতে পারে না এই ব্যাপারটা মেসির কাছে যথেষ্টই হতাশাব্যঞ্জক ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে যদি বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা ব্যর্থ হয়। আর বিশ্বকাপ জিতে মারাদোনার যোগ্য উত্তরসূরী হয়ে ওঠার দায়বদ্ধ তাও যে আছে মেসির কাছে।

দাবা বিশ্বকাপে ব্যর্থ ভারতীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কৃষ্ণণ সমীকিরণ, সূর্যশেখর গাঙ্গুলিরা আর কবে বিশ্বনাথন আনন্দের ব্যাটন বহন করার উপযুক্ত হবেন? শুধু গ্রাণ্ডমাস্টার হয়ে, এশিয়া ও কমনওয়েলথ খেতাব জিতেই কি এভাবে বিস্ময় বালক সূর্য ফুরিয়ে যাবেন? সমীকিরণ বিশ্বপর্যায়ে প্রথম কুড়ির মধ্যে আছেন। তিনি অন্তত কেন কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবেন না? সম্প্রতি রাশিয়ার টেলি শহর শিনস্কে বিশ্ব নক-আউট দাবায় নিজেদের সুনাম ও অতীত কীর্তির প্রতি মোটেই সুবিচার করতে পারেননি সূর্য, সমী দুজনেই অথচ ভারতীয় দাবা দিগন্তে সূর্য, সমী বছরের পর বছর ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে রাখেন।

প্রতিটি বিশ্বকাপে কেন ভারতীয় গ্র্যাণ্ডমাস্টাররা ব্যর্থ হল, এই ব্যাপারটা নিয়ে দাবা ফেডারেশনের তদন্ত কমিটি বসানো উচিত। ফেডারেশন এখন দাবাড়ুদের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। তাই প্রতি বছর ২/৩ জন করে গ্র্যাণ্ডমাস্টার বেরিয়ে আসছে। বিগত একাধিক টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ পাচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে অনুশীলন করে ও ডামি গেম খেলার মাধ্যমে। তাও এই অবস্থা কেন?

শুধুমাত্র মাঝারি মাত্রার আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট জিতে নিজের এলো রেটিং বাড়িয়ে রাখলে যে একজন গ্র্যাণ্ডমাস্টারের প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না—এই বোধটুকু নিশ্চয়ই আছে ওদের।

এবার বিশ্বকাপ হওয়ার আগে সূর্য, সমী, হরিকৃষ্ণ, অভিজিৎ কুণ্ডু প্রত্যেকেই পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়েছেন। থিওরিও প্র্যাকটিক্যাল দু'ধরনের ট্রেনিং নিয়েছেন বিদেশী প্রশিক্ষক ও তাত্ত্বিকের কাছে। ইন্টারনেট ও ল্যাপটপে সাম্প্রতিক কালের সব ম্যাচ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সবদিক থেকে তৈরি হয়েই এশিয়া গেছিলেন দশ সদস্যের ভারতীয় দল। অথচ পুরুষ ও মহিলা দু'ক্ষেত্রেই তাদের হতাশাজনক ফল দেখে এদেশে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠা খেলাটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে।

দেশের প্রতিটি বড় শহরে বহু কচিকাঁচাকে দাবা বোর্ডের আশেপাশে দেখা যায়। তা ওই জনপ্রিয়তার ফলশ্রুতি। বিশ্বনাথন আনন্দ ভারতবর্ষে দাবা বিপ্লব নিয়ে এসেছেন একার হাতে। সেই বিপ্লবের ফসল আজকের সূর্যশেখর, সমীকিরণ, হরিকৃষ্ণদের। আর মেয়েদের দাবামুখী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের কোমেরু হাম্পি। বিশ্ব চাম্পিয়ান না হলেও সেমিফাইনাল, ফাইনালে উঠেছেন। তার এলো রেটিং যে কোনও পুরুষ গ্র্যাণ্ডমাস্টারের কাছেও ঈর্ষণীয়। এই দুজনের সাফল্য ও গৌরবের আলোয় উদ্ভাসিত ভারতীয় দাবা ওদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উঠে আসা একঝাঁক তরুণ-তরুণী গ্র্যাণ্ডমাস্টার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

সেই স্বপ্ন যাতে কাগজে-কলমে আটকে না থাকে তা দেখার দায়িত্ব ওদেরই। আর তার জন্য দাবা অলিম্পিয়াড ও বিশ্বকাপে পারফর্ম করতে হবে। দশ-বারো ক্যাটাগরির আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অবশ্যই যে শেষ কথা নয় তা বিশ্বনাথন আনন্দকে দেখে নিশ্চয় বুঝেছেন সূর্যরা।

শব্দরূপ - ৫২৯

আকাশ নিয়োগী

■	১		২	■	৩		৪
■		■		■		■	
৫	■	■	৬			■	
৭				■	■	■	
	■	■	■	৮			
	■	৯			■	■	
	■		■		■	১০	■
১১			■	১২			■

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. শিবের অষ্টবিভূতি বা ঐশ্বর্যের অন্যতম, যোগলব্ধ ঐশ্বরিক শক্তিবিশেষ, ৩. ধনের দেবতা, ধনাধিপতি যক্ষরাজ, ৬. লেবু সমার্থে দশমহাবিদ্যার অন্যতম, ৭. প্রতিশব্দে বর্বরতা, নীচতা, মধ্যে বিলম্ব, ৮. কশ্যপ ও কালকার পুত্র, বৃত্রাসুরের অনুচর, প্রথম দুয়ে সময়, দুয়ে-চারে বিলীন হওয়া, ৯. বিদর্ভরাজ ভীমের পুত্র, শেষ দুয়ে হৃদয়, ১১. ধর্মবিশ্বাস, বিবেকবুদ্ধি, মধ্যে জননী, ১২. শুদ্ধ শব্দে তকলি, সুতো কাটার ও জড়িয়ে রাখার শলাকা বিশেষ।

উপর-নীচ ঃ ১. দধীচির অস্থিতে নির্মিত ইন্দ্রের অস্ত্র, কুলিশ, ২. তন্ত্রশাস্ত্রের বিধান অনুসারে সাধনা করা, একে-তিনে নিশানা, ৩. আয়ানের ভগিনী, রাধিকার ননদিনী, ৪. কোনও প্রতিষ্ঠানের পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে উৎসব, ৫. অভাবের সংসারে পরিজনদের পেটুকপনা, ৮. বিশেষণে নির্লজ্জ, বেহায়া, ৯. দিক অর্থে দক্ষিণ এর কোমল রূপ, ১০. লোহার এই বালা হিন্দু সধবা নারীর হাতের শোভা।

সমাধান শব্দরূপ - ৫২৭

সঠিক উত্তরদাতা

দেবলীনা দাস (তনুশ্রী)
সাহাপুর, মালদা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	■	■	বা	■	মা	ল	সা
■	ই	সি	জি	■	টা	■	ই
হা	■	■	মা	লু	ম	■	ক্লো
ই	মা	র	ত	■	■	■	স্টা
গ্রো	■	■	■	ব	ন	সা	ই
মি	■	ক	ন	ক	■	■	ল
টা	■	পা	■	শি	মূ	ল	■
র	কে	ট	■	শ	■	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫২৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৮ ডিসেম্বর, ২০০৯ সংখ্যায়

নয়াচরে কেমিক্যাল হাব

উদ্বিগ্ন রাজ্যের পরিবেশবিদ ও সাধারণ মানুষ

নবকুমার ভট্টাচার্য

সালিমদের জলের দরে নয়াচর বিক্রি করে এক নয়াকীর্তি স্থাপন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নয়াচরে ১৩ হাজার একর জমিতে কেমিক্যাল হাব ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নিয়ে রাজ্য সরকার যেভাবে গোপনে চুক্তি করেছে তাতে উদ্বিগ্ন সকলেই। কেন এই উদ্বিগ্নতা? কারণ কেমিক্যাল হাব নিঃশব্দ ঘাতক। পশ্চিমবঙ্গে যে কেমিক্যাল হাব গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে নয়াচরে, তা নির্দিষ্টভাবে পেট্রো-রসায়ন শিল্পগুচ্ছের প্রস্তাব। একে নিছক কেমিক্যাল হাব না বলে পেট্রোকেমিক্যাল হাব বলাই উপযুক্ত।

নয়াচরেই কেন?

প্রথমেই বলা প্রয়োজন এই নয়াচরে কেমিক্যাল হাব প্রকল্প রাজ্য সরকার বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের একটি প্রেস্টিজ ইস্যু। নন্দীগ্রামে ধাক্কা খাওয়ার পর নয়াচরে যে করেই হোক এই শিল্প তালুক গড়তে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এজন্যই গোপনে চুক্তি করে ১২৬৮ কোটি টাকার জমি মাত্র ২১ কোটিতে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর অধিগ্রহণের ফলে কত মানুষ উৎখাত হতে পারেন এবং সেই উৎখাত হওয়া মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কোথায় হবে সরকার এসব নিয়ে ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন। নয়াচরে কেমিক্যাল হাব হলে উৎখাত হওয়ার সমস্যা প্রবল হবে না। কারণ নয়াচরের জমির প্রায় সবটাই সরকারের এবং যেখানে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ বসবাস করেন। অপরদিকে পেট্রো-রসায়ন শিল্প মালিকরা সেইসব স্থানে শিল্প গড়ে তুলতে আগ্রহী হচ্ছে সেখানে শ্রম সস্তা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ শিথিল আর শিল্প গড়ার জন্য উপস্থিত হরেক রকমের সুযোগ সুবিধা মিলবে। এমনকী ব্যয়সংকোচের খাতিরে ন্যূনতম নিরাপত্তার ব্যবস্থাটুকুও যেখানে না করলে চলে। ভূপাল গ্যাস কাণ্ডে এটা দেখা গেছে। উল্লেখ্য, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে এমন অনেক রাসায়নিক দ্রব্য আছে কঠোর নিয়মের ফলে সেগুলির প্রক্রিয়াকরণ সেদেশে নিষিদ্ধ, কিন্তু তাদের আমদানি নিষিদ্ধ নয়। তাই তারা উৎপাদন তাদের দেশে না করে আমাদের দেশে করবে। ক্ষতি হলে আমাদের দেশে হবে ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার মতো। আমাদের যুক্তি আমরা বিনিয়োগ পাচ্ছি, অগ্রগতি পাচ্ছি, আধুনিকতা পাচ্ছি। ওদের বাতিল শিল্প, পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর শিল্প পেয়ে আমরা বলব 'কেমিক্যাল হাব' পেয়েছি। আমাদের বেকারির জ্বালা এত তীব্র যে কারখানা হয়ে ভয়ঙ্কর দূষণ ছড়ালেও দু'মুঠো অন্নসংস্থান তো হবে। আমাদের দারিদ্র্য, অসচেতনতা ও রাজনৈতিক নেতাদের অসততার সুযোগ নিচ্ছে পুঁজিবাদী দেশগুলো। সিপিএম সরকার ১২৬৮ কোটি টাকার জমি মাত্র ২১ কোটিতে দিচ্ছে কেন? ভালবেসে নিশ্চয়ই নয়।

নয়াচরে কেমিক্যাল হাব গঠন কতটা নিরাপদ?

জোয়ার ভাঁটা এবং নদীর নিজস্ব স্রোতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নয়াচরের সৃষ্টি। ফলতঃ এই চরগুলির দ্বীপ অঞ্চলের প্রবাহ প্রকৃতির সঙ্গে এক সচল সাম্যাবস্থায় থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়। এটা পরিষ্কার, নয়াচরের পাড় বেঁধে দিলে জোয়ার ভাঁটা এবং নদী প্রবাহের গতি ভাঙন সৃষ্টি করতে বাধ্য। নদীজাত দ্বীপের এই ক্ষয় খুব স্বাভাবিক। একে দীর্ঘ সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব। এছাড়া এই অঞ্চলে প্রায়শঃই ঘূর্ণিঝড় হয়। বড়োসড়ো ঘূর্ণিঝড় হলে নয়াচরে ডুবে যাবে। জলোচ্ছ্বাসের ফলে কেমিক্যাল হাবের উপজাত রাসায়নিক মাল-মশলা ভেসে গিয়ে হুগলী নদীতে ঢুকে গিয়ে জলের দূষণ গোটা দক্ষিণবঙ্গের নদী তীরবর্তী অঞ্চলে এক ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। জিওল্যাজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত জরিপের ফলে জানা গেছে, নয়াচরে ভূমির সর্বোচ্চ উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ১০৫ মিটার। ১৯৭০-৭৫ সালে সমোচ্চ রেখাচিত্র জরিপ, কন্টুর সার্ভে করে দেখা গেছে আশেপাশের অন্যান্য ব-দ্বীপ যেমন—হেনরি, ফ্রেডরিক মৌসুনি, পাতিবুনিয়া ইত্যাদি সব দ্বীপেরই ভূপৃষ্ঠ গড় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মোটামুটি পাঁচফুট (১.৫ মিটার) উপরে।

আবার গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে জোয়ারের গড় উচ্চতা ৩০৬ মিটার। অর্থাৎ বাঁধ না থাকলে অল্প সময়ের জন্য হলেও গোটা চরের ওপর জল থাকবে অন্তত ২ মিটার। জোয়ারের সর্বোচ্চ উচ্চতা বেশি হলে অর্থাৎ ভরা কোটাল, উপকূলীয় সাইক্লোন জনিত ঝড়-বৃষ্টির সময় এই অঞ্চলে নদীর জল ৭-৮ মিটার ফুলে ওঠে। কেউ কেউ মনে করছেন নয়াচরের চারদিকে বাঁধ দিয়ে মাটি ভরাট করে জমিকে উঁচু করে ফেলা সমস্যা নয়। জুরং দ্বীপে যা করা হয়েছে। বস্তুত সেখানে নীচু ও জলাজমি পুনর্ব্যবহার যোগ্য করা হয়েছে। কিন্তু নয়াচর আর জুরং দ্বীপ কি এক? জুরং দ্বীপের প্রাকৃতিক অবস্থান ও ভূ-বৈজ্ঞানিক গঠন কি নয়াচারের সঙ্গে তুলনীয়। সিঙ্গাপুরের দক্ষিণ উপকূলে সেলাট প্রণালীতে জুরং দ্বীপ অবস্থিত। জুরং পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প-হাব বলতে যে স্থানটা বোঝায় তা অতীতে ছিল সাতটি ছোট ছোট দ্বীপ। প্রায় ২০ কোটি বছরের পুরোনো কঠিন শিলাস্তর দিয়ে গঠিত এই দ্বীপগুলি। ছোট ছোট দ্বীপগুলির মাঝখানের জায়গাটা কৃত্রিমভাবে ভরাট করে পুরো অঞ্চলটা নিয়ে পেট্রোরসায়নিক শিল্পের জন্য ৩২ বর্গ কিমি জায়গা বের করা হয়েছে। জুরং-এর মূল ভিত হল পাথরের আর নয়াচরের মূল ভিত তৈরি হয়েছে মিহি পলিমাটি দিয়ে। ছোট ছোট শিলাদ্বীপ দিয়ে গঠিত জুরং-এর সঙ্গে নদী ও জোয়ারের সঙ্গে সচল, নরম, পলিমাটি দিয়ে গঠিত নয়াচরের তুলনা চলে কি?

নয়াচর দ্বীপের এক দৃশ্য।

আমাদের বেকারির জ্বালা এত তীব্র যে কারখানা হয়ে ভয়ঙ্কর দূষণ ছড়ালেও দু'মুঠো অন্নসংস্থান তো হবে। আমাদের দারিদ্র্য, অসচেতনতা ও রাজনৈতিক নেতাদের অসততার সুযোগ নিচ্ছে পুঁজিবাদী দেশগুলো।

কর্মসংস্থান কতটা হবে?

রাসায়নিক শিল্প—যেগুলি প্রধানত উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চ মূলধন বিশিষ্ট। এখানে বিপুল পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদিত হয়। দ্রব্যমান বজায় রাখা, ব্যয়সংকোচ এবং প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্বয়ংক্রিয় এবং কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করা হয়। এজন্য শ্রমিকের প্রয়োজন কম হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর যোগ হচ্ছে ১২ লক্ষ নতুন কর্মপ্রার্থী। ২০০৭ সালের আগস্ট মাসের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে—জেটিসি কর্পোরেশন, জুরং দ্বীপ প্রকল্প রূপায়ণের ভারপ্রাপ্ত সংস্থা জানিয়েছে তখন পর্যন্ত জুরং দ্বীপে ৯০টি পেট্রোকেমিক্যাল্‌স সংস্থা মোট বিনিয়োগ করেছে ২৭০০ কোটি মার্কিন ডলার এবং এর ফলে কর্মসংস্থান হয়েছে ১২০০ মানুষের। অর্থাৎ ১১ কোটি টাকা পিছু একজন। হলদিয়া পেট্রো-রসায়ন শিল্পে বিনিয়োগ হয়েছে ৬০০ কোটি টাকা, কর্মীসংখ্যা ৬৭০ জন। তবে অনুসারী শিল্পেও কিছু কর্মসংস্থান হবে। ২০০৫-০৬ সালের অর্থবন্টন পরিকল্পনা বক্তৃতায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী জানাচ্ছেন, হলদিয়া পেট্রো-রসায়ন প্রকল্পে অনুসারী শিল্প হয়েছে ৬৮৪টি। তবে এগুলিতে কত কর্মসংস্থান হয়েছে তার হিসেব নেই। তবে ওই বক্তৃতায় বলা হয়েছে ১৯৯৪-৯৫ সালে ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা ছিল ১৯.১ লক্ষ ও কর্মসংস্থান ছিল ৪৩০৮ লক্ষ অর্থাৎ শিল্প পিছু ২.৩ জনের মতো। ২০০০-০১ সালে এগুলি বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ২৭.৭ লক্ষ ও ৫৮.৭ লক্ষ অর্থাৎ শিল্প পিছু ২০১ জনের মতো। অপরদিকে নয়াচরে কেমিক্যাল হাব হলে জীবিকা হারাবেন প্রায় ২ লক্ষ মৎস্যজীবী।

নয়াচরে কেমিক্যাল হাবে দুর্ঘটনা হলে কি হবে?

ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় যা হয়েছে তাই হবে—কোম্পানিগুলো রাতারাতি পালাবে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অদৃশ্য কারণে নিশ্চুপ থাকবে। হয়তো বছরের পর বছর মামলা চালাবে কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ক্ষতিটা হবে সাধারণ মানুষের। কেমিক্যাল হাবে কোনও দুর্ঘটনার জন্য বিষাক্ত রাসায়নিক যদি সেখানকার জলে মেশে তবে ব্যাপক এলাকা দূষিত হবে। ধ্বংস হবে বিপুল জলজীবী প্রাণীর। মানুষের জীবন ও নানা রোগে বিপন্ন হবে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্রের মতে নয়াচরে কেমিকেল হাব হলেই ৪ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, দূষিত হবে প্রতিদিনকার পানীয় ৪৬৩ কোটি গ্যালন জল। তাঁর মতে, নয়াচরে হুগলি নদীর মোহানায় সমুদ্র। নদীই শুধু নয়, ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডারও মারাত্মক দূষিত হবে।

কেন এই গোপন চুক্তি?

পরিবেশ বিশেষজ্ঞ অভী দত্ত-মজুমদারের মতে, বিপজ্জনক কেমিকেল হাব প্রকল্প কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট রেগুলেশন আইন ভেঙে হতে চলেছে, তাই এই গোপন চুক্তি। কিন্তু সাধারণ লোকের মতে ১২৬৮ কোটি টাকার জমি মাত্র ২১ কোটিতে দেওয়া হয়েছে অন্য কারণে। সিঙ্গুরে টাটাকেও অল্প পয়সায় জমি দেওয়া হয়েছিল এবং সেই চুক্তিও গোপন ছিল।

রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্বের মতে অল্প পয়সায় জমি দেওয়া হয়েছে এই জন্য, একটা বিপুল পরিমাণ টাকা পার্টি ফাণ্ডে রোজগার করার জন্য। তাই এই চুক্তি রাজ্যের মানুষ মানছে না।

স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন করাতেই সাহায্য

তরুণ পণ্ডিত, মালদা ॥ মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার মহারাজপুর (গড়পাড়া) গ্রামের স্বরূপ দাস দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ বাম হাতের দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে ভুগে যখন স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানালেন তখন সরকারের টনক নড়ল। গত ১১ নভেম্বর যন্ত্রণায় থাকতে না পেরে স্বরূপ দাস তার বাম হাতটি কুনইয়ের নিচ পর্যন্ত নিজেই কেটে ফেলেন। এরপর এই প্রতিবেদক 'সাপ্তাহিক মালদা সমাচারে' ছবি সহ তার নিজের হাত নিজে কেটে ফেলে স্বেচ্ছামৃত্যুর খবর ছাপায়। ১৯ নভেম্বর ২৪ ঘণ্টা, আকাশ বাংলা সহ বেশ কয়েকটি টি.ভি. চ্যানেলে স্বরূপ দাসের করুণ কাহিনী—একমাত্র উপার্জনশীল ৩৪ বছরের স্বরূপ দাস তার স্ত্রী, ৫ বছরের কন্যা, বৃদ্ধ বাবা, মা ও ঠাকুমাকে নিয়ে অনাহারে কীভাবে দিনযাপন করছে তার খবর প্রচারিত হয়। তারপর ২৪ ঘণ্টা চ্যানেল মারফৎ স্বরূপ দাসের বাবাকে মন্ত্রী রেখা গোস্বামী মহাকরণে ডেকে পাঠান। তাঁদের একটি সংস্থা থেকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা স্বরূপের বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তার একদিন পর স্বরূপ দাসকে মালদায় তার বাড়ী থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে চিত্তরঞ্জন ন্যাশানাল ক্যান্সার হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এখন তার চিকিৎসা চলছে এবং পরিবারটি বাঁচার আলো দেখছেন।

এদিকে দূরদর্শনে এই খবর দেখে সি.পি.ডব্লিউ. ডি. অফিসার্স ওয়াইভস্ অ্যাসোসিয়েশন ২৭ নভেম্বর তাদের অফিস থেকে (নিজাম প্যালেস, কোলকাতা-২০) স্বরূপ দাসের বাবার হাতে ১৫ হাজার টাকার চেক ও ৫ হাজার টাকার চাল-ডাল তুলে দেয়। সরকার থেকে স্বরূপ দাসের চিকিৎসা করানোর জন্য এবং পরিবারটিকে বাঁচানোর জন্য সব রকমের চেষ্টা চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, স্বরূপ দাসের চিকিৎসার জন্য অরবিন্দ যোগ মন্দির লাইব্রেরী ও ক্লাব, বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি এবং গ্রামবাসীরাও সাহায্য করেছিলেন।

বৈদ্যুতিন মাধ্যম যে একটি মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারে স্বরূপ দাসের করুণ কাহিনী প্রচার করে সরকারি সাহায্য পাওয়া তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত স্বরূপ দাসের চিকিৎসা ক্যান্সার হাসপাতালে হলেও ঠিকমতো চিকিৎসা হচ্ছে না বলে জানা গেছে। পরে মন্ত্রীর আপ্ত সহায়কের প্রচেষ্টায় ডাক্তার স্বরূপকে দেখে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে শুরু করেছেন বলে জানা যাচ্ছে।

Swastika
14 December - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

জাতপাত, পূজা পদ্ধতির উর্দ্ধে একল বিদ্যালয়

একল বিদ্যালয় সংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল বীরেন জে শাহ।

(৯ পাতার পর)

❑ আপনারা আদিবাসীদেরই টার্গেট করলেন কেন?

● প্রশ্নের ভাব এবং শব্দের মধ্যে বিভ্রাট আছে, প্রথমে তার নিরসন হওয়া দরকার। প্রথমত আদিবাসী শব্দটি আমরা ব্যবহার করি না। এটা উচিতও নয় বলে আমরা মনে করি। কেননা এদেশের আবহমান কাল ধরে বসবাসকারীরা আদিবাসী হয় তাহলে এই মুনি-ঋষি ভগবান রামচন্দ্র, কৃষ্ণ এঁরা কারা? এরা কি পরবাসী না পরদেশী? আসলে বৃটিশরা এদেশের সংস্কৃতিকে খাটো করতেই জনজাতিদের আদিবাসী বলে প্রচার করেছে। যাতে করে বিশ্বের মাঝে ভারতীয় সংস্কৃতির, ভারতীয় ঋষি-মুনির কৃতিত্ব প্রকাশ না পায়। দ্বিতীয়ত 'ওদের টার্গেট করলাম কেন?' এটাও আপত্তিজনক শব্দ, ওরা আমাদেরই। আমরা সকলেই এই মহান দেশ ও সংস্কৃতির অঙ্গ। এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে এদেরকেও জাতীয় জীবনের মূলধারার সঙ্গে জুড়তে হবে। তাই এ কাজ আমাদের, আমাদের দেশের সকলের। জাতীয়তাবাদের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েই এই দায়িত্ব আমরা পালন করে চলেছি। এখানে টার্গেট শব্দটি শোভনীয় নয়।

❑ এই অভিযানে শিক্ষক হিসাবে কাদেরকে নিয়োজিত করছেন?

● যে কোনও দেশপ্রেমী উৎসাহী যুবকই এই কাজে আসতে পারেন। প্রাথমিকভাবে কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এবং এই কাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্যগত দিকগুলি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির জন্য কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর কাজের মধ্যে থাকতে থাকতে নিজেরাই সব বুঝতে পারে এবং উদ্যোগ নিয়ে কাজে মেতে থাকে।

এফ টি এসের চিত্র প্রদর্শনীশালায় মুরলী মনোহর যোশী।

'বন্যেরা বনে সুন্দর' - এফ টি এসের বনযাত্রা।

❑ শিক্ষক নির্বাচনে বা এই বিদ্যালয় পরিচালনায় সংখ্যালঘুদের কি কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়?

● সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু এখানে কোনও উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। প্রথমেই তো বলা হয়েছে দেশের ন' কোটি জনজাতি এবং পিছিয়ে পড়া ভাই-বোনদের সংস্কারিত করা, শিক্ষার আলোকে আনা এবং তার মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দের স্বপ্নের সমৃদ্ধ ভারত গঠনের পথকে প্রশস্ত করাই আমাদের লক্ষ্য।

❑ যদি কোনও সংখ্যালঘু ভাই-বোন একল বিদ্যালয়ে আসে তবে কি নেওয়া হবে?

● প্রথমেই তো বললাম এই দৃষ্টিকোণই আমরা রাখি না। আমাদের কর্মপদ্ধতি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য আমরা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে বলছি এবং প্রকাশ্যে তা তুলে ধরছি। আমরা কোথায় কাজ করছি, কাদের নিয়ে করছি এবং কেন করছি তাও পরিষ্কার। সুতরাং এ প্রশ্নই অসার।

❑ এমনও দেখা গেছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে থেকে ধর্মান্তরকরণে আপনাদের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। সেক্ষেত্রে আপনারা কি বলবেন?

● সেই একই কথা। সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু নিয়ে ভাবনার মতো সময় নেই। আমরা যে ভিত্তির উপর কাজ করছি তা তো এই দেশেরই সনাতন সংস্কৃতি। অভিযোগ যে কেউই করতে পারে, তা নিয়ে রটনা হতেও পারে কিন্তু ঘটনা হল, আমরা তো প্রথম থেকেই বলছি এই দেশ এই সংস্কৃতি নিয়ে। এই প্রাচীন সংস্কৃতির আধারেই সমস্ত কিছু। এ সম্পর্কে গর্ব করা স্বাভিমানী করে তোলা আমাদের লক্ষ্য। ভারতবর্ষের বাইরে থেকে অনেক মতাবলম্বীরা এসে এদেশের সহজ সরল জনজাতিদের তাদের পরম্পরা পূর্বপুরুষদের অশ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছে। বিদেশী ভাবধারায় চলতে শিখিয়েছে। একল বিদ্যালয় অভিযান হবার ফলে তা অনেকটা ব্যাহত হয়েছেই এবং বহু জায়গায় স্বাভিমানী জনজাতিরা পুনরায় পূর্বপুরুষ পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠে তারা তাদের ভুল শুধরে নিচ্ছে। এখানে যদি কারো অভিযোগ থাকে থাকুক। আমাদের আদর্শ উদ্দেশ্যে আমরা অটুট।

❑ যে সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতির কথা বলে চলেছেন তা তো আখেরে হিন্দু ধর্ম বা হিন্দুত্বই। এর সঙ্গে তো রামমন্দির, বজরং দল-আর এস এস এগুলোর তো যোগাযোগ রয়েছে।

● সনাতন ধর্মই যে হিন্দুধর্ম এটা যদি আপনি বা আপনারা বুঝে থাকেন তাহলে বলবো সেটা ঠিক বুঝেছেন। এটা আমি বলছি না, স্বামী বিবেকানন্দই বহু জায়গায় একথা বলেছেন। এই ভাবনা বা চিন্তার সঙ্গে আপনি যে সংগঠনগুলোর নাম করলেন তারাই তাদের ব্যাপারে উত্তর দেবেন। ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নয়ন ভারতীয়ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয়দের দ্বারাই হবে এমন ভাবনায় বিশ্বাসী। তাতে কে কি ভাবলো সে ব্যাপারে আমরাই কিছু ভাবতে রাজি নই। এই ভাবনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যারা কাজ করছে বা করবে আমরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

এফ টি এসের অনুষ্ঠানে নৃত্যের পর সোনাল মান সিং।

❑ এই একল বিদ্যালয়ের ভাবনা আপনারা কোথা থেকে নিয়েছেন?

● এই পদ্ধতি ভারতবর্ষের অত্যন্ত পুরনো পদ্ধতি। প্রাচীন ভারতে যে গুরুকুল পদ্ধতি ছিল তার সঙ্গে অনেকটাই সাযুজ্য রয়েছে। তবে বর্তমান সময়ের দিকে নজর দিয়ে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেই প্রাচীন ভাবনাকেই আধুনিক উপযোগী করে বাস্তবায়িত করার প্রয়াস বলতে পারেন।

❑ সাধারণ মানুষের মধ্যে এর গ্রহণ যোগ্যতা বাড়ছে?

● উত্তরোত্তর বিদ্যালয় সংখ্যা, ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা, এবং শিক্ষক শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধিই তো এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির পরিচায়ক।

প্রকাশিত হবে ২১ ডিসেম্বর '০৯ স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে ২১ ডিসেম্বর '০৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রায় সাতশো বছর আগে তুঙ্গভদ্রার তীরে গড়ে উঠেছিল এক বিস্ময়কর দুর্গনগরী– বিজয়নগর। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানী। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত ছিল এই সাম্রাজ্যের আধিপত্য। এই বছর (২০০৯) বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রাণপুরুষ সম্রাট কৃষ্ণদেব রায়ের রাজ্যাভিষেকের ৫০০ বর্ষ। এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে স্বস্তিকা-র নিবেদন দুটি মননশীল রচনা সহ সাহিত্যিক এবং মনীষীর দৃষ্টিতে বিজয়নগর সাম্রাজ্য।

।। নিয়মিত আকারেই প্রকাশিত হবে।। দাম একই থাকছে।।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম ত্রর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com